সাধারণ সমীক্ষার আলোকে উচই

শ্যামলাল দেববর্মা

গবেষণাধিকার ঃ
উপজাতি ও তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর,
আগরতলা, ত্রিপুরা।

১৯৮৩ ইং

পূর্বাভাষ

ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশনার মাধ্যমে দেশের বৃহত্তর অংশের জনগণের সাথে পরিচয় সাধনের কাজে ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি গবেষণা অধিকার বহুদিন যাবত নিযুক্ত। গবেষণা অধিকার ইতিপূর্বে বিভিন্ন উপজাতি সম্বন্ধে পুস্তকাদি প্রকাশ করেছে।

শ্রীশ্যামলাল দেববর্মার গবেষণামূলক লেখা "সাধারণ সমীক্ষার আলোকে উচই" আমাদের প্রকাশনার আরেকটি নবতম সংযোজন। এই পুস্তিকায় লেখক উচইদের সামাজিক প্রথাপ্রকরণ, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি যত্নসহকারে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন।

উপজাতি জনজীবনের সাথে পরিচয়ে আগ্রহী সমাজের নিকট আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা করা যায়।

আগরতলা PRICE Rs. 7 00

শৈলেশ রঞ্জন নন্দী

অধিকর্তা,
গবেষণা অধিকার,
ত্রিপুরা সরকার।

সূচীপত্র

কয়েকটি কথা — ক, খ

প্রথম অধ্যায় ঃ

পরিবেশ — ১—৩

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

উচৈ্দের পরিচিতি — ৪—১২

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

অর্থনৈতিক ক্রিয়া কলাপ — ১৩—১৯

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

সামাজিক কাঠামো ও প্রথা — ২০—৩১

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান — ৩২—৩৮

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

উপসংহার — ৩৯—৪২

গ্রন্থপঞ্জী— ৪৩

চিত্রমালা— ৪৪—৪৬

উচুই অধ্যুষিত ত্রিপুরার মানচিত্র— ৪৭

কয়েকটি কথা

উপজাতি ও তপশীল জাতি কল্যাণ দপ্তরের গবেষণাধিকার উচইদের জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার কাজের ভার আমাকে দেওয়ার ফলে আমার বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর জীবন-চর্চা জানার অতৃপ্ত আকাঙ্খার দ্বার খুলে গেল।

তবে এই ধরণের চুক্তিবদ্ধ কাজে সময়ের বাধা ধরা নিয়ম থাকায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক কিছুর সংযোগ সাধন করা যায় না। সব চাইতে বড় কথা হল, আগ্রহ থাকা আর গবেষণার কাজ এক জিনিষ নয়। তাই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এ কাজ করতে গিয়ে আমাকে ভীষণ বেগ পেতে হয়েছিল। আগরতলা বীরবিক্রম সান্ধ্য কলেজের এসিষ্ট্যান্ট প্রফেসার ডঃ জগদীশ গণচৌধুরী মহাশয়ের নির্দেশিকা আমার একাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। তাঁর এই নিঃস্বার্থ নির্দেশিকা ভিন্ন আমার এ কাজের সফলতা সম্ভব ছিল না।

এ ছাড়া সর্ব্বপ্রথমেই যার নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন শিলাছড়ি হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীফিলিপ উচই-এর। এ সমস্ত কাজে তিনিও খুবই আগ্রহী। আমার আগেই তিনি ব্যক্তিগত উদ্দীপনায় উচইদের উপর গবেষণার কাজ করে 'উচই জাতীয় ইতিহাস' নামে একটি পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই পাণ্ডুলিপি দেখার সৌভাগ্য আমার ঘটেনি। তবে ঐ পাণ্ডুলিপির বক্তব্য তাঁর স্মরণে যা ছিল সে টুকুই আমাকে সাহায্য করে-ছিলেন। বিশেষ করে কিংবদন্তীর কাহিনীগুলি তাঁর কাছ থেকেই সংগ্রহ করা। এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন যে, এ কাজের জন্য আমি যখনই যে কোন উচই পাড়ায় গিয়েছি সেখান থেকেই প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা আমার কাজের গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। উত্তর একছড়ি গাঁওসভার প্রধান শ্রীসঘরাম উচই, আগরতলা বুদ্ধ মন্দিরের ভিক্ষু শ্রীঅক্ষয়ানন্দ ভান্তে (উচই), ব্যাপটিষ্ট পাস্তর শ্রীরসময় উচই, শ্রীসধারায় উচই, শ্রীঅর্ধেন্দু উচই, শ্রীজগত উচই, শ্রীঅমরচন্দ্র উচই, শ্রীএরাধন উচই প্রত্যেকেই আমাকে কিছু না কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন।

উপজাতি গবেষণাধিকারের লিগ্যুইষ্টিক অফিসার শ্রীদেবপ্রিয় দেববর্ম্মণ বিভিন্ন সময়ে আমাকে বিভিন্ন ভাবে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে কাজের গতি বজায় রেখেছেন। এছাড়া একই অধি-কারের শ্রীরামগোপাল সিংহ ও শ্রীঅমরেন্দ্র দেববর্মা সহ বিভিন্ন স্তরের কর্মীরাও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকারের 'নতুন ত্রিপুরা'র সম্পাদক শ্রীভীমদেব ভট্টাচার্য্য ভাষার খুঁটিনাটি বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট পরামর্শ দিয়েছেন। একই অধিকারের শ্রীঅসীম দত্তরায় ও হরিপদ দেববর্মা সহ অনেক কর্মী বিভিন্নভাবে আমার কাজে সহায়তা করেছেন।

যতনবাড়ী সিনিয়র বেসিক স্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীঅরুন দেববর্মা, করবুক অঞ্চলের ট্রাইব্যাল সুপারভাইজার শ্রীমনমোহন দেববর্মা, শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা, শ্রীকার্ত্তিক দেববর্মা প্রমুখ ক্ষেত্র কাজে সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে থেকেছেন। আমি তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই চিরঋণী।

সর্বশেষে একথা বলতে হয়, আমার সীমিত জ্ঞানে এই ক্ষুদ্র পরিসরে যতটুকু সম্ভব উচইদের জীবন ও সংস্কৃতি তুলে ধরতে চেষ্টা করেও পূর্ণ তৃপ্তি পাইনি। শুধু ভবিষ্যত গবেষকদের কাছে আমার এই প্রাথমিক কাজ সামান্যতমও সাহায্য করতে পারে, এই আশা পোষণ করেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

আগরতলা
১৪-৯-১৯৮৩

শ্যামলাল দেববর্মা

প্রথম অধ্যায়

পরিবেশ

পাখীর ঠোঁটের মত ছোট্ট ত্রিপুরা ভারতের উত্তর পূর্বদিকে অবস্থিত। ১০,৪৭৭ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এ রাজ্যের উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব বাংলাদেশের যথাক্রমে শ্রীহট্ট, কুমিল্লা (তিপেরা), নোয়াখালি, চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমানা দ্বারা বেষ্টিত। একমাত্র পূর্বদিকে আসাম ও মিজোরামের সীমানা দ্বারাই ভারতের সাথে এরাজ্যের সংযোগ রক্ষা চলে। ভারতবর্ষ যখন ইংরেজদের দ্বারা শাসিত ছিল তখন এরাজ্য "পার্বত্য ত্রিপুরা" নামে অবহিত হত। এখনও এরাজ্য মোট আয়তনের ৬০ শতাংশ চিত্রোপম পাহাড় এবং নিবিড় বনে সমাচ্ছন্ন। এরাজ্যের প্রধান পাহাড়গুলোর মধ্যে দেবতামুড়া, বড়মুড়া, আঠারমুড়া, লংতরাই, শাখানটাং ও জম্পুই পাহাড় এবং প্রধান নদীগুলির মধ্যে ফেনী, মুহুরী, গোমতী, হাওড়া, খোয়াই, ধলাই, মনু, দেউ, জুরি এবং লংগাই নদীর নাম উল্লেখযোগ্য।

ত্রিপুরার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ত্রিপুরার বর্তমান রাজধানীর নাম আগরতলা। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ এরাজ্যের তিনটি জেলায় মোট দশটি, যথা—ধর্মনগর, কৈলাশহর, কমলপুর, সদর, খোয়াই, সোনামুড়া, উদয়পুর, বিলোনীয়া, অমরপুর এবং সাব্রুম মহকুমা অবস্থিত।

ত্রিপুরার জনসংখ্যাকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(১) আদিম বাসিন্দা (২) অভিবাসী এবং (৩) তদানীন্তন পাকিস্তান তথা অধুনা বাংলাদেশ থেকে আগত অধিবাসী বৃন্দ। উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত অধিবাসীরা এরাজ্যের আদিম বাসিন্দা। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা আগে জুম চাষের মত স্থান পরিবর্তনশীল কৃষিকাজ করলেও পরবর্তী সময়ে সমতল চাষে অভ্যস্ত হয়ে স্থায়ী বসবাস শুরু করেছিলেন। উল্লিখিত দুই নং অভিবাসীরা অবিভক্ত বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে জীবিকার প্রয়োজনে ত্রিপুরায় এসে পরবর্তী সময়ে এরাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা বনে যান। তিন নং অধিবাসীরা দেশ বিভাগের পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে তদানীন্তন পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেন এবং ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে এরাজ্যে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন।

জনসংখ্যা

এই ভাতৃঘাতি দাঙ্গার শিকার হয়ে স্বাধীনোত্তর ভারতে বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত ক্রমাগত উদ্বাস্তু আগমনের ফলে ত্রিপুরার জনসংখ্যা কী পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে তা নীচের আদমসুমারীর তালিকা লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়।

সন	জনসংখ্যা	বৃদ্ধির শতকরা হার
১৯০১	১,৭৩,৩২৫	২৬ শতাংশ
১৯১১	২,২৯,৬১৩	৩২.৫ শতাংশ
১৯২১	৩,০৪,৪৩৭	৫২.৬ শতাংশ

১	২	৩
১৯৩১	৩,৮২,৪৫০	২৫.৬ শতাংশ
১৯৪১	৫,১৩,০১০	৩৪.১৪ শতাং
১৯৫১	৬,৩৯,০২৯	২৪.৫৬ শতাংশ
১৯৬১	১১,৪২,০০৫	৭৮.৭১ শতাংশ
১৯৭১	১৫,৫৬,৩৪২	৩৬.৩২ শতাংশ

এখানে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, ১৯৪১-১৯৫১ সনে যেখানে জনসংখ্যার শতকরা হার ছিল ২৪.৫৬ শতাংশ সেখানে ১৯৫১-১৯৬১ সনের মধ্যে ৭৮.৭১ শতাংশ জনসংখ্যা বেড়ে গেছে। এরকম অস্বাভাবিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঘটনা দেশের আর কোন জায়গায় ঘটেনি।

১৯৭১ সনের আদমসুমারী অনুসারে ত্রিপুরার মোট উপজাতির জনসংখ্যা ৪,৫০,৫৪৪ জন। ইহা মোট জনসংখ্যার ২৮.৯৫ শতাংশ। ১৯৫১-১৯৬১ সনে এই সংখ্যার হার ছিল ৩১.৫৩ শতাংশ। এরাজ্যের বসবাসকারী উপজাতি জনগোষ্টীকে মোট ১৯ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—(১) ত্রিপুরী (২) রিয়াং (৩) জমাতিয়া (৪) চাকমা (৫) হালাম (৬) নোয়াতিয়া (৭) মগ (৮) লুসাই (৯) উচুই (১০) কুকি (১১) গারো (১২) মুণ্ডা (১৩) ওরাং (১৪) সাওতাল (১৫) খাসিয়া (১৬) ভীল (১৭) ছাইমাল (১৮) ভূটিয়া ও (১৯) লেপচা।

উপজাতি জনসংখ্যা

১৯৭১ সনের আদমসুমারী অনুযায়ী বিভিন্ন উপজাতিদের মোট জনসংখ্যা এবং তাদের শতকরা হারের তালিকা নীচে দেয়া গেল :

ক্রমিক সংখ্যা	উপজাতি গোষ্ঠী	লোকসংখ্যা	মোট উপগোষ্ঠী জনসংখ্যার শতকরা হার
১.	ত্রিপুরী	২,৫০,৩৮২	৫৫.৫৭ শতাংশ
২.	রিয়াং	৬৪,৭২২	১৪.৩৬ শতাংশ
৩.	জমাতিয়া	৩৪,১৯২	৭.৫৯ শতাংশ
৪.	চাকমা	২৪,৬৬২	৬.৩৬ শতাংশ
৫.	হালাম	১,৯০,৭৬	৪.২৩ শতাংশ
৬.	নোয়াতিয়া	১০,২৭৩	২.২৮ শতাংশ
৭.	মগ	১৩,২৭৩	২.৯৪ শতাংশ
৮.	লুসাই	৩,৬৭২	·৮১ শতাংশ
৯.	উচই	১,০৬১	·২১ শতাংশ
১০.	কুকি	৭,৭৭৫	১.৭৭৫ শতাংশ
১১.	গারু	৫,৫৫৯	১.২৩ শতাংশ
১২.	মুণ্ডা	৫,৩৪৭	১.১৮ শতাংশ
১৩.	ওরাং	৩,৪২৮	.৭৮ শতাংশ

১	২	৩	৪
১৪.	সাওতাল	২'২২২	.৪৯ শতাংশ
১৫.	খাসিয়া	৪৯১	নগন্য
১৬.	ভীল	১৬৯	ঐ
১৭.	ছাইমল	—	—
১৮.	ভুটিয়া	৩	নগন্য
১৯.	লেপচা	১৭৫	ঐ

১৯৪৯ সনের ১৫ই অক্টোবর ত্রিপুরা ভারতের অঙ্গ রাজ্য হিসাবে যোগ দেয়। এর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্যন্ত এরাজ্য দেশী রাজাদের দ্বারা শাসিত হত। এরূপ ১৭৮ জন দেশীয় রাজার এ রাজ্য শাসন করার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারবর্ষে মুসলিম শাসনকালে এ রাজ্য বহুবার আক্রান্ত হলেও বিভিন্ন উপায়ে স্বকীয়তা রক্ষা করেছিল এবং ইংরেজ শাসনকালেও পার্ব্বত্য ত্রিপুরা হিসাবে এরাজ্য পরিগণিত হত। উপরে বর্ণিত সময়ের পর থেকে ত্রিপুরা 'সি' রাজ্য হিসাবে ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে চীফ কমিশনারের দ্বারা শাসিত হত। ১৯৭২ সনের ২১ জানুয়ারী ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা লাভ করে এবং একজন গভর্ণর ও মন্ত্রীসভার সদস্যদের দ্বারা এ রাজ্য শাসিত হতে শুরু করে।

শাসন কার্য

বর্ত্তমানে বামফ্রন্টের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে বারজন সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভার সদস্যদের দ্বারা এরাজ্য শাসিত হচ্ছে। উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব সহ বর্ত্তমান মন্ত্রিসভায় চার জন উপজাতি সদস্য আছেন।

এ রাজ্যে বসবাসকারী সংখ্যালঘু উপজাতিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক সহ সার্বিক উন্নয়ন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তথা জাতীয় সংহতির লক্ষ্যে বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ১৯৭৯ সনে বিধানসভায় "দি ত্রিপুরা অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল" নামে একটি বিল পাশ করিয়ে সংবিধানের সপ্তম তপশিল মোতাবেক স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করেছেন। ১৩৭টা রেভিনিউ মৌজা নিয়ে গঠিত এবং ২৮টি টেরিটোরিয়েল কনষ্টিটিউয়েন্সীতে বিভক্ত এই জেলা পরিষদের প্রথম নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮২ সালের ৩রা জানুয়ারী। জেলা পরিষদের এই প্রথম নির্ব্বাচনে বামফ্রন্ট সংখ্যাধিক্য অর্জন করে এবং শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা পায়। চেয়ারম্যান শ্রীনারায়ণ রূপিনী, ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীঅঘোর দেববর্মা সহ সাত জন কার্যকরী সদস্যদের দ্বারা এই পরিষদের শাসনকার্য পরিচালিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
উচইদের পরিচিতি

'উচই' নামের তাৎপর্য

'উচই' এই নামাঙ্করণের পেছনে কোন সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য বা অভিমত না থাকায় তাঁদের তথা কগবরকভাষী অন্যান্য উপজাতি, যথা ত্রিপুরী, জমাতিয়া, রিয়াং প্রভৃতি উপজাতি সমাজের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী কিংবা কিংবদন্তী বিশ্লেষণ করলেই এই নামের উৎপত্তি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়।

কিংবদন্তী মতে রিয়াংদের পরে কিংবা রিয়াদের পশ্চাৎ অনুসরণ করেই তাঁরা ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছিলেন বলে রাজা কর্তৃক তাঁরা 'উলছই' উপাধি পান। 'উলছই' কগবরক শব্দ। উল—পশ্চাৎ, ছই—অনুসরণ করে। উল ছই ফায় নাই—পশ্চাৎ অনুসরণ করে যে আসে। এই উল-ছই শব্দই পরবর্ত্তী সময়ে উছই বা উচই শব্দের রূপান্তরিত হয়। অন্যান্য কগবরকভাষীরা তাঁদেরকে কেউ কেউ উলছই বা উছই বা উচুই বলে থাকেন।

অনেকের মতে উচ্ছার বংশধর বলেও তাঁদেরকে উচই বা উচাই বলা হয়। ইংরাজীতে নাম লেখার সময় তাঁরা অনেকে পদবী রূপে 'Uchoi' আবার কেউ কেউ 'Uchai' লেখে থাকেন। মুদ্রিত সরকারী নথীগুলিতে 'Uchai' লেখা রয়েছে বলে আধুনিক শিক্ষিতরা 'উচাই' লেখার পেছনে যুক্তি দেখান। আবার বয়স্কদের মধ্যে অনেকেই তাতে ঐক্যমত পোষণ করেন না।

সে যাই হোক 'উচই' শব্দটির মধ্যেই বুৎপত্তিগত অর্থ প্রকাশ পায় বলে আমরা 'উচই' শব্দটিই ব্যবহার করলাম।

কিংবদন্তী মতে উচইদের ইতিকথা

কোন এক সময় আরাকান রাজার সাথে জনৈক ত্রিপুর রাজা যুদ্ধে পরাজিত হলে অনেক ত্রিপুর সৈন্য বন্দী হয়ে আরাকান দেশে নীত হয়। পরবর্ত্তী সময়ে সেই বন্দী সৈন্যরা আরাকান রাজের বশ্যতা স্বীকার করলে আরাকান রাজা তাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করেন। সুদীর্ঘ-দিনের ব্যবধানে আরাকান বাসীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তারা নিজেদের বংশবৃদ্ধি ঘটায় এবং আরাকানের অধিবাসী বনে যায়। উচইরা সেই বন্দী ত্রিপুর সৈন্যদেরই বংশধর।

আরাকান বাসীদের চোখে তারা একটু স্বতন্ত্র ছিল বলে রাজার আদেশে আরাকান সীমানার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে গং দ্রং পাহাড়ে তাদের একত্রে পুনর্ব্বাসন দেয়া হয়। ঐ পাহাড় অত্যন্ত উঁচু ছিল বলে পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত গোষ্ঠি ব্যতীত অন্যদের পক্ষে আনায়াসে উঠানামা করা বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল।

যা হোক, সেদিন ছিল সেই পাহাড়ের চূড়ায় বিবাহ ভোজের অনুষ্ঠান। আবালবৃদ্ধবণিতার আনন্দ কোলাহলে, গানবাজনার উত্তাল তরঙ্গে কেঁপে উঠেছিল গং ভ্রং পাহাড়ের আকাশ বাতাস। বাঁশীর সুরে চংপ্রেং এর তালে পাহাড়ও বোধ হয় সেদিন নেচেছিল দু' বাহু তুলে। এ রকম ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক উল্লাসপূর্ণ অনুষ্ঠান আর কারো ঈর্ষার কারন হয়ে না উঠলেও সে দিনের সেই অনুষ্ঠান ঈর্ষা বর্ষণ করেছিল পার্শ্ববর্তী আরাকানবাসী-দের। কারণ পাহাড়বাসীরা অপমান করেছে তাদের দেশীয় রাজাকে। কেননা, পাহাড়-বাসীদের চংপ্রেং এর সুরে তারা সেদিন শুনতে পেয়েছিল, "নাইগ্যা নাকাইন নাকাইন কাইন"। আরাকান ভাষায় যার অর্থ দাঁড়ায় 'দেশের রাজা কানা তাই প্রজারাও কানা।'

রাজা প্রথমে সে কথা বিশ্বাস করতে রাজী না হলেও সমবেত প্রজাদের মনোযোগ পূর্ণ নালিশের তোড়ে ভেসে গেলেন এবং আদেশ করলেন, "এদের নির্ব্বংশ করো"।

যেই রাজার আদেশ পাওয়া যায় অমনি হৈ হৈ রৈ রৈ করে সমস্ত প্রজারা ধেয়ে চলল পাহাড়ের দিকে। পাহাড় বাসীরা যদিও এই অভাবিত ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না, তবু আত্ম-রক্ষার্থে তারাও সমস্ত আনন্দ উল্লাস বন্ধ করে নারীপুরুষ নির্বিশেষে গাছ পাথর ছুড়ে ফেলতে লাগল আক্রমনকারীদের উদ্দেশ্যে। আক্রমনকারীরা পাহাড়বাসীদের অনবরত প্রতিরোধ ঠেলতে না পেরে বিশ্রাম নিল সারাদিনের মত। বসে রইল রাতের অপেক্ষায়।

হঠাৎ তাদের নজরে পড়ল, একটি গোসাপ উঠে যাচ্ছে পাহাড় বেয়ে। সবাই মিলে তখন ধরে ফেলল গোসাপটিকে। গোসাপের লেজে শক্ত একটি দড়ি বেধে ছেড়ে দিল উপরের দিকে। প্রথম গোসাপের লেজে বাধা সেই দড়ি বেয়ে একজন ধীরে ধীরে উঠে গেল পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে একটি মোটা গাছের গোড়ায় দড়ি বেঁধে দড়ির একাংশ ফেলে দিল নীচের দিকে। একে একে সেই দড়ি বেয়ে সমস্ত আক্রমনকারীরা উঠে গেল পাহাড়ের চূড়ায়। পাহাড়বাসীরা সেরকম অপ্রত্যাশিত আক্রমনের জন্য কেহই তৈরী ছিলনা। তাই এরকম বেপরোয়া আক্র-মনের মুখে একে একে তাদের প্রাণ দিতে হল আরাকান বাসীদের হাতে। অন্ধ হয়ে নির্মম হত্যায় মেতে উঠল আরাকান বাসীরা। সে নিধন যজ্ঞ যেন আর থামে না।

মর্মস্পর্শী সেই হত্যা কাণ্ডে মরমে ভীষণ আঘাত পেলেন রাজার ছোট বোন। অনেক কষ্টে তিনি পৌছলেন নিধনযজ্ঞক্ষেত্রে। কিন্তু তখন প্রায় সব শেষ। এক মাসের দুই শিশুপুত্র ব্যতীত তিনি আর কাকেও জীবিত পাননি পাহাড়বাসীদের। সেই দুই শিশুপুত্রকে 'বাসেক'-এ (এক খণ্ড কাপড় বা গামছা, যা দিয়ে দিয়ে শিশুকে কোলে বেঁধে রাখা হয়) বেঁধে নিয়ে এলেন নিজের ঘরে। তাদের পালতে লাগলেন নিজ সন্তান স্নেহে। উচ্ছা ও রিংসা নামধারী সেই দুই ভাই ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল অন্যান্য আরাকান শিশুদের মতই। এক সময় তারা যৌবনে পদার্পন করলে তাদের বিয়ে দেওয়া হল একই মায়ের দুই বোনের সাথে। শুরু হল তাদের বংশবৃদ্ধি।

এক সময় বোধ হয় তাদের পূর্ব্ব পুরুষদের জন্মভূমির ডাক পেয়ে যায় উচ্ছা ও রিংসারা। তাই একদিন 'নথাই' (বেতের তৈরী ঘন খাড়াবিশেষ) এর ভেতর 'মাইচু, (মোচাভাত) সহ অন্যান্য যাবতীয় জিনিষ ভরে একত্রে রওনা দেয় ত্রিপুরার পথ ধরে।

উচ্ছা রিংসারা হাঁটছে তো হাঁটছেই। পথের যেন আর শেষ নেই। তাদের হাঁটারও বিরাম নেই। পূর্ব পুরুষদের জন্মভূমির অদৃশ্য টান যেন ধুয়ে দিচ্ছে তাদের সমস্ত পথক্লেশ। তবু এক সময়ে আগ্রাসী ক্ষিধে তাদের ধরে ফেলে। একটি বিরাট গাছের তলায় তাদের সমস্ত জিনিষপত্র নামিয়ে সবাই লেগে যায় ক্ষুন্নিবৃত্তির কাজে। সামনেই তারা দেখতে পেল. তির তির করে দুধারায় বয়ে চলছে একটি নদী ও ছড়া। শুধু ভাততো আর খাওয়া যায় না তাই উচ্ছারা নদীর জলে নেমে পড়ে মাছ ধরতে আর রিংসারা ছড়ার জলে। উভয় দলই পায় প্রচুর চিংড়িমাছ। রান্নার সময় দেখা গেল রিংসাদের চিংড়িমাছ খুব সহজে লালচে বর্ণ ধরছে। তখন তারা বুঝতে পারে চিংড়ি সেদ্ধ হয়ে গেছে। তাই তারা তাড়াতাড়ি খেয়ে ছেড়ে হাঁটা শুরু করে গন্তব্য স্থলের উদ্দেশ্যে। অপরদিকে উচ্ছাদের চিংড়ি আর লালচে বর্ণ ধরছে না। (নদীর চিংড়ি নাকি সেদ্ধ হলেও লালবর্ণ ধরে না)। তাই তারা ব্যস্ত থাকে আরো জাল দেওয়ায়। অনেকক্ষণ জ্বাল দেওয়ার পর চিংড়ির বর্ণ যখন লাল হলনা তখন তারা ধরে নিল এমাছ আর সেদ্ধ হবেনা। সুতরাং তাড়াতাড়ি সেই আধা সেদ্ধ (আসলে কিন্তু সেদ্ধ হয়েছিল), তরকারি নামিয়ে খেয়ে তারাও অনুসরণ করল রিংসাদের।

রিংসারা সামনের দিকে এগোয় আর রাস্তার দুধারের কলাগাছ কেটে প্রমাণ রেখে আসে তাদের অগ্রসরের। সেই কাটা কলাগাছ দেখে দেখেই উচ্ছারাও এগুতে লাগল সামনের দিকে। কাটা কলাগাছের বাড়ন্ত পাতা দেখে তারা হঠাৎ এক সময় বুঝে উঠে হয়ত রিংসাদের ধরা আর সহজ হবেনা। তারা চলে গেছে অনেক অনেক দূর এগিয়ে। এজন্মের মত হয়তো আর তাদের সাথে দেখা হবেনা। হঠাৎ তাদের বুকে উথলে উঠল বিচ্ছেদের ব্যথা। একযোগে সমস্বরে কেঁদে ডাকতে আরম্ভ করল রিয়াংদের। যে নদীর পারে বসে উচ্ছারা বিচ্ছেদের কান্না কেঁদেছিল এবং বুক ফাটিয়ে ভাইদের ডেকেছিল তার সাক্ষী দেখার জন্যই বোধহয় আজো অধুনা বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে চলছে 'কাতুয় বা কাবতুয় রেঙতুয়' নদী।

সত্যিই রিংসারা সে ডাক শুনতে পায়নি। তারা উচ্ছাদের অনেক আগেই বর্তমান ত্রিপুরার সীমা অতিক্রম করে রাজধানীতে পৌছে। সেই ছিল ছিল রাজবাড়ীতে কের পূজা। কেরপূজার 'খঙ' (সীমানা) চারদিকে পোতা থাকলেও ভিন্ন পরিবেশ বর্দ্ধিত রিংসারা সে বাধা না মেনে এগিয়ে যায় রাজন্তপুরের দিকে। দারোয়ানের কোন বাধা তারা মানতে চায়নি। কেননা, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল রাজার সাথে দেখা করা।

কিন্তু কের পূজার নিয়ম ভঙ্গ করার দায়ে রাজার আদেশে রিংসাদের দেওয়া হল জেলখানার আশ্রয়। এবং একথাও জানিয়ে দেওয়া হল যে, রাজ্যের নিয়ম ভঙ্গকারী হিসাবে পরদিন ভোরেই তাদের মাথা কাটা যাবে। সমূহ বিপদের কথা চিন্তা করে রিংসারা তাদের পথের শ্রান্তি, অবসাদের সমস্ত কথা ভুলে গিয়ে জেলখানার ভেতরেই কান্না জুড়ে দিল 'আমুং আমুং' বা মা মা বলে।

তাদের সেই বুকফাটা 'আমুং আমুং' ডাক বোধহয় রাণী শুনতে পেলেন। তাই একসময় ধীরে ধীরে খুলে গেল জেলখানার দরজা। খোলা দরজার ভেতরে দিয়ে মাতৃসদৃশ রাণীকে ঢুকতে দেখে রিংসাদের কান্না আরো দ্বিগুণ বেড়ে গেল। রাণী অভয় দিলেন তাদের। সমস্ত কথা শুনলেন মনোযোগ দিয়ে। তারপর বললেন—তোমরা যদি সত্যিই আমার সন্তান হও, তাহলে আমার বুকের দুধ তোমাদের মুখে পড়বে।

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই রাণী তাঁর বুকের দুধ বের করলেন এবং শতধারায় সে দুধ গিয়ে পড়ল রিংসাদের মুখে। রাণী বুঝলেন, রিংসাদের কথাই ঠিক। তাই তিনি রাজাকে অনুরোধ করলেন তাদের ছেড়ে দিতে এবং রাণীর অনুরোধে রাজাও ছেড়ে দিলেন রিংসাদের। আধুনিক রেষ্ট হাউসের মত একটি জায়গায় তাদের আপাতত থাকতে দিলেন সেইদিনের মত। (কিংবন্তীর একাহিনীর সাথে রাজমালায় উল্লিখিত রাণী গুনবতীর রিয়াংদের দুধ খাওয়ানোর কিছু সাদৃশ্য আছে।)

জেলখানা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর রিংসারা দারোয়ানকে জানিয়ে এসেছিল যে, পরদিন তারা রাজাকে একটি ছোট্ট উপহার দেবে। তারা ভেবেছিল, রাজাকে ছোট্ট উপহার দেবার কথা বলে যদি বড় জিনিষ উপহার দেয়া হয় তাহলে রাজা খুব খুশী হবেন। তাই অনেক ভেবেচিন্তে তারা হাট থেকে একটি মহিষ কিনে নিয়ে তাদের বিশ্রামাগারের বাইরে বেঁধে রাখে।

উচ্ছারা রাজ বাড়ীতে পৌছতেই রাজ বাড়ীর কের পূজাও শেষ হল। সুতরাং রিংসাদের মত তাদের জেলখানার আশ্রয়ে বসে অবধারিত মৃত্যুর কল্পলোকে বিচরণ করতে হয়নি। রিংসাদের যে জায়গায় থাকতে দেয়া হয়েছিল রাজানুদেশে তার পাশের টিলাতেই উচ্ছাদেরও আপাতত থাকার ব্যবস্থা হল। রিংসাদের মত তারাও দারোয়ানকে জানিয়ে এসেছিল যে, পরদিন তারা রাজাকে বড়জিনিষ উপহার দেবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা যে সময় হাটে গিয়েছিল সে সময়ে হাটে কোন বড় জিনিষ মিলেনি। কেননা সন্ধ্যা হয়ে আসায় হাট প্রায় ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাই বহুকষ্টে তারা একটি ছাগল যোগার করতে সক্ষম হয়। উচ্ছাদের মনে তাই স্বস্তি নেই। তারা কেবল জল্পনাই করতে থাকে, রাজাকে কী ভাবে বড় জিনিষ উপহার দেয়ার ব্যবস্থা করা যায়। হঠাৎ তাদের খেয়াল হল, রাজাকে উপহার দেওয়ার জন্য রিংসারা কি কিনেছে তা দেখবার। রিংসাদের আস্তানায় গিয়ে তারা দেখতে পেল, উঠানে বেঁধে রাখা হয়েছে একটি মহিষ। তা দেখেই তো তাদের মাথা ঘোরার পালা। কি, রিংসারা রাজাকে উপহার দেবে বড় জিনিষ। না, তা হয় না, হতে দেবো না। ঈর্ষার বসবর্তী হয়ে উচ্ছারা রিংসাদের মহিষের জায়গায় বেঁধে রেখে এল তাদের ছাগল আর নিজিদের আস্তানায় নিয়ে এল রিংসাদের মহিষ।

পরদিন ভোরে উঠে রিংসারা দেখতে পায়, তাদের মহিষের জায়গায় ছাগল বাঁধা। তারা বুঝতে পারে, এ কাজ উচ্ছাদেরই। কিন্তু তখন আর কিছু করার সময় ছিল না। কেননা রাজার সাথে দেখা করার সময় বয়ে যায় যে। অগত্যা সেই ছাগল নিয়েই তাদের হাজির

হতে হল রাজ দরবারে। আগের দিনের কথার সাথে তাদের উপহার মিলে যাওয়ায় রাজা খুশী হলেন এবং তাদের স্থায়ীভাবে এরাজ্যে থাকার অনুমতি দিলেন।

অপরদিকে উচ্ছারা ভোরে রাজ বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য খুঁটি থেকে যেই মহিষের দড়ি খুলল অমনি মহিষটি দিল এক দৌড়। সব উচ্ছারাই ছুটল মহিষটির পেছনে পেছনে। সে কী দুরন্ত মহিষ। কিছুতেই বশ মানতে চায় না। শেষ পর্যন্ত বহুকষ্টে মহিষটিকে ধরাধরি করে রাজার কাছে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত রাজাকে বড় জিনিষ উপহার দেয়। তাদের প্রতিও রাজা সমান খুশী হন এবং স্থায়ীভাবে নিজ রাজ্যে বসবাসের অনুমতি দেন।

উচই ও রিয়াংদের মধ্যে সম্পর্ক

পূর্ব্বোক্ত কাহিনীর সূত্রানুযায়ী উচই ও রিয়াংরা দুই ভাইয়ের বংশধর বলে আজও পরস্পর বিশ্বাস করেন। বিশেষ করে তাঁরা পরস্পরের মধ্যে 'তাথুক' বা ভাই সম্বোধনই বেশীর ভাগ করে থাকেন। এমন কি বৈবাহিক সম্পর্কও তাদের মধ্যে খুব বেশী হয়ে থাকে।

উচই ও রিয়াংদের মধ্যে চালচলন, কথাবার্তা বলার ধরণেও গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পাঠকবর্গের সুবিধার্থে নীচে বাংলা অর্থ সহ ত্রিপুরী, উচই ও রিয়াংদের সংখ্যা গণনার উদাহরণ দেয়া গেল।

বাংলা	ত্রিপুরী	উচই	রিয়াং
এক	সা	হা	হা
দুই	নৗয় (নুয়)	নৗয় (নুয়)	নৗয় (নুয়)
তিন	থাম	থঁা	থঁা
চার	বৗরৗয় (বুরুয়)	বৗরৗয় (বুরুয়)	বৗরৗয় (বুরুয়)
পাঁচ	বা	বা	বা
ছয়	দক	দক	দক
সাত	সিনি	সিনি	সিনি
আট	চার	চা	চা
নয়	চুকু	চুকু	চুকু
দশ	চি	চি	চি

পূজা পার্ব্বন ও নাচ গানের বেলায় তাদের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য বর্ত্তমান। এ রাজ্যে অন্যতম সর্ব্বাধিক পরিচিত 'রিয়াং হজাগিরি' বা লক্ষ্মী পূর্ণিমার ব্রত উদ্‌যাপের নাচ উচইরাও নেচে থাকেন।

তবে পোষাক পরিচ্ছদের বেলায় উচই মহিলাদের সাথে রিয়াং মহিলাদের বৈশাদৃশ্য কিছু নজর পড়ে। যেমন, উচই মহিলারা গলাভর্তি পুঁতির মালার সর্ব্বশেষে একছড়া টাকার মালা এবং রিয়াং মহিলারা গলাভর্তি টাকার মালা ব্যবহার করেন। আবার রিয়াং মহিলাদের তুলনায় উচই মহিলারা একটু পাশ বাড়িয়ে পাছড়া পড়ে থাকেন বলেও উচইরা দাবী করেন।

পূর্ব ইতিহাস

পূর্ব্বে বর্ণিত কিংবদন্তীর কাহিনী অনুযায়ী উচইরা আরাকান রাজ কর্তৃক বন্দী ত্রিপুর সৈন্যদের বংশধর। অনেক পণ্ডিতদের বক্তব্যেও সে কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কর্ণেল ফেয়ারের ভাষায় "আরাকানের প্রাচীন নরপতি ত্রিপুরা রাজ্য জয় করিয়া কতগুলি ত্রিপুরাকে বন্দীস্বরূপ স্বরাজ্যে লইয়া যান. আধুনিক মুরুংগন সেই সকল বন্দী ত্রিপুরার সন্তান সন্ততি।" মুরুংদের পরিচয় প্রসঙ্গে কৈলাস চন্দ্র সিংহ বলেছেন, "আরাকান বাসীগণ সমগ্র ত্রিপুরা জাতিকে মুরুং আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া থাকে।" অনেকের মতে অতি প্রাচীন কালে ত্রিপুরা গণ ম্রোহাউং অঞ্চলে বাস করতেন বলে আরাকানবাসীগণ তাদের ম্রোহাউং বা ম্রোহুং বা মুরুং বলতেন।

কর্ণেল ফেয়ারের মতে এঁরা প্রথমে আরাকান জেলায় লেমোই নদীর তীরে বাস করে পরবর্তী সময়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে প্রধানতঃ মাতামুড়ি নদীর তীরে বাস করা শুরু করেন। অধুনা বাংলাদেশের মতামুড়ি অঞ্চলেও ত্রিপুরা উচইদের আত্মীয়স্বজন বর্তমান থাকার সাক্ষ্য মেলে। এছাড়া শংখনদী কর্ণফুলিতেও তারা ছড়িয়ে আছেন। সেই সূত্রানুযায়ী কর্ণেল ফেয়ার বর্ণিত মুরুংগনের সঙ্গে আধুনিক উচইদের সম্পর্ক অতি উজ্জল বলা যায়।

অন্য দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টির আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, অতীতের কোন এক সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা ব্রহ্মপুত্র থেকে বার্মা এবং বাংলার সীমানা থেকে আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ধর্মমাণিক্য কর্তৃক আরাকান বিজয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই সময়ে কতগুলি সৈন্য সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনের পরিবেশও অনুকূলে থাকার ফলে আরাকানে বাস করা শুরু করে স্থায়ীভাবে সেখানে থেকে যান। ক্রমে ক্রমে তাঁরা আরাকানবাসী বিভিন্ন উপজাতিদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেদের বংশবৃদ্ধি ঘটান। এরূপ ঘটনা শুধু উচইদের ক্ষেত্রেই নয়, নাইতং, মংবাই, তংবাই, খাক্রু ইত্যাদি উপজাতিদের ক্ষেত্রেও সেরূপ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরবর্তী সময়ে আরাকানে অবস্থিত ত্রিপুরাগণের অনেকে বিভিন্ন কারণে আরাকান ত্যাগ করে ধীরে ধীরে ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। সুদীর্ঘদিনের ব্যবধানে ত্রিপুরা সংস্কৃতির অনেক কিছু বর্জন এবং আরাকান উপজাতিদের অনেক কিছু গ্রহণ করে নতুন সংস্কৃতির রক্ষক হয়ে তাঁরা ত্রিপুরায় এসে নতুন নামে পরিচিতি লাভ করেন।

কোন সময় থেকে তাঁরা উচই উপাধি অর্জন করেন, তার কোন সঠিক তথ্য না থাকলেও একথা বলা যায় যে, বর্তমান ত্রিপুরায় আসার আগেই তারা এই উপাধির অধিকারী ছিলেন। সম্ভবতঃ আরাকান থেকে চট্টগ্রামে আসার সময়েই তারা উচই উপাধি পেয়েছিলেন বলে ধারণা করা যায়। কেননা পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যে উচইদের উল্লেখ

পাওয়া যায়। টি. এইচ. লেউন তাঁদের উসুই বলে উল্লেখ করেন। ("There are four clans of the Tipperah tribe resident in the Chittagong Hill Tracts, as follows : The pooranthe Nowuttea, the osuie and the Reang".—T. H. Lewin : Wild races of South Eastern India.) অধুনা বাংলাদেশে বসবাসকারী উচইরা নিজেদের উসুই ত্রিপুরা বা উচই তিপরা বলে পরিচয় দেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামেও উচইরা মগ, চাকমা, হালাম, খেয়াং ইত্যাদি উপজাতিদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। খেয়াংদের সঙ্গে উচইদের সম্পর্ক আরাকান থেকেই ছিল কিনা সেকথা বলা অত্যন্ত কঠিন। কেননা খেয়াংগণও একসময় আরাকানে ছিলেন। (The last Tribe We shall notice are the 'Kleyns, who in habit the mountains between Arracan and Ava, "H. B. Rowney : The wild Tribes of India)

কৈলাশ চন্দ্র সিংহ খেয়াংদের সম্পর্কে বলেছেন, 'ব্রহ্মদেশের পশ্চিম প্রান্তে পরাক্রমশালী খেয়াং জাতি বাস করে। ইহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। স্বাধীন খেয়াং বংশসম্ভূত কতগুলি লোক চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে বাসা করিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।"

উচইদের বারটি উপ-শাখার মধ্যে খেয়াংদের নাম উল্লেখ আছে বলেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হল। সে যাহোক, উচইরা মঙ্গোলীয় গ্রুপের তিব্বতী বার্মিজ ভাষাগোষ্ঠীর ত্রিপুরা বা মুরুংদের গোত্র—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাদের প্রশস্ত মাথা, ছোট চোখ, বোটা নাক, পুরু ঠোঁটের বৈশিষ্ট গুলিই মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর পক্ষে রায় দেয়।

ভাষা

উচইরা 'কউক্র' বা 'কগবরক' ভাষায় কথা বলেন। এই 'কউব্র' বা কগবরগ তিব্বতী-বার্মিজ ভাষাগোষ্ঠীর বোডো শাখার অন্তর্গত। এরাজ্যের ত্রিপুরী, রিয়াং, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রূপিনী, কলই, উচই, মুরাসিং —এই আট জনগোষ্ঠীর লোকেরা এই ভাষায় কথা বলেন। নীচে বাংলা অর্থ সহ ত্রিপুরী ও উচইদের দ্বারা ব্যবহৃত কতকগুলি ক্রিয়ার রূপ দেওয়া গেল।

বাংলা	ত্রিপুরী	উচই
বসা	আচুক	আচুক
দাঁড়ানো	বাচা	বাচা
কান্না	কাপ	কাপ
খাওয়া	চা	চা
পানকরা	নুঙ/নাঁড	নুঙ/নাঁড
যাওয়া	থাং	থাং
আসা	ফায়	ফায়
দেখা	নুক	নুক
ধরা	রম	রম
দেখা	নুক	নুক
বাজানো	ডাম	ডাম

উপরের তালিকানুযায়ী ত্রিপুরী এবং উচইগণ অভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। এদের মাতৃভাষা কগবরক বর্তমানে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজভাষা। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার প্রথম এই ভাষাকে রাজ্যভাষার মর্যাদা দিয়ে কগবরকভাষী ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। সরকারী প্রচেষ্টায় তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার থেকে এই ভাষায় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশকার্য চলছে। বলা বাহুল্য, এই ভাষার সার্বিক উন্নয়নে রাজ্যের বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।

উচইদের বাসস্থান

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের রাজত্বকালে উচইরা প্রথম বর্তমান ত্রিপুরায় আসেন। তাদের ত্রিপুরা আগমনের নেতৃত্বে ছিলেন রামানন্দ উচই (হেডম্যান)। প্রথমে তারা মহারাজা কর্তৃক বিলোনীয়া মহকুমার স্রকবাই বা চড়কবাই অঞ্চলে পুনর্ব্বাসিত হন। (স্রকবাই কগবরক শব্দ। স্রক=মাটির সরা বা ঢাকনা। বাই=ভেঙ্গে যাওয়া। কথিত আছে পুনর্ব্বাসন পাওয়ার পর তাদের উক্ত অঞ্চলে পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই একজনের হাত থেকে একটি সরা মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে যায়। তখন থেকেই ঐ অঞ্চল স্রকবাই নামে পরিচিত হয়। পরবর্তী সময়ে এই স্রকবাই শব্দই বাংলায় চড়কবাই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।) সেখান থেকে ঐ মহকুমারই মুহুরীপুর ও রতনপুরে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন। পরে জীবিকার প্রয়োজনে তারা অমরপুর ও ধর্মনগরের বিভিন্ন জায়গায় বাসস্থান গড়ে তুলেন। অমরপুরের তীর্থমুখ, রতনবাড়ী, কেয়াই উচইপাড়া, মঘরাম পাড়া, শান্তিনগর রাঙ্গাছড়া, তকথুমা, তুইসামা, পশ্চিম ডেপাছড়া, কালাছড়া এবং চেলাগাং এর সাত্রাইফাং পাড়াগুলিতে উচইরা থাকেন। ধর্মনগরের তৈরেং দশদা ও জম্পুই পাহাড়ের পাদদেশে ইতস্তত: ভাবে তাদের দেখা যায়।

সংখ্যা

১৯৭১ সালের লোকগণনায় উচইদের মোট সংখ্যা দেখানো হয়েছে ১,০৬১ জন। ইহা মোট উপজাতি জনসংখ্যার শতকরা ·২১ শতাংশ। দক্ষিণ ত্রিপুরাতে তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী। পশ্চিম জেলায় তাদের সংখ্যা একেবারেই নগন্য। নীচের তালিকা লক্ষ্য করলেই তাদের বাসস্থান ও মোট জনসংখ্যার স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে।

জেলা	মহকুমা	জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	সর্ব্বমোট জনসংখ্যা
পশ্চিম	সদর	১	১	
	খোয়াই			
	সোনামুড়া			
উত্তর	ধর্মনগর	৫৬		
	কৈলাশহর		৫৬	
	কমলপুর			১,০৬১

দক্ষিণ	বিলোনীয়া	৩৩৩
	সাব্রুম	
	উদয়পুর	৬
	অমরপুর	৬৬৫

অনেক শিক্ষিত উচইদের মতে, রাজ্যে তাদের সংখ্যা আরো বেশী হওয়ার কথা ছিল। সংখ্যা কম হওয়ার পেছনে দুটি প্রধান কারণ উল্লেখ করে তারা বলেন, অনেক হিন্দু উচই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করার ফলে তারা নিজেদের উচই সমাজ বহির্ভূত মনে করেন এবং বৈষ্ণব বলেই নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে অমরপুর তীর্থমুখের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁরা অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। দ্বিতীয়ত:, অনেক উচই এর নিজেকে রিয়াং পরিচয় দান। এ প্রসঙ্গে তাঁরা কোন এক সময়ের রাজ্য বিধানসভার জনৈক সদস্য মহাশয়ের নামও উল্লেখ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ

ভারতের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের অন্যান্য উপজাতিদের মত উচইরাও বংশপরম্পরায় প্রাকৃতিক পরিবেশে লালিত ও বর্দ্ধিত। তাই তাদের অর্থনৈতিক বনিয়াদও গড়ে উঠে প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে। প্রকৃতির সবুজ বনানীর গভীরেই সঞ্চিত থাকে তাদের অর্থ। তাদের খাদ্য সংগ্রহ বা আহরণের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপও তাই প্রকৃতির উন্মুক্ত বন ও পাহাড়কে ঘিরেই। প্রধান খাদ্য থেকে আরম্ভ করে ফলমূল জাতীয় আনুষঙ্গিক তাদের যত খাদ্যই বন থেকে আহরিত। এক কথায় বলা যায়, বন এবং পাহাড়ই প্রাথমিকভাবে উচইদের খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা মেটায়। বন ও পাহাড়কে ঘিরে তারা যে অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে তোলেন তাতে প্রত্যেকেই স্বনির্ভর থাকেন। এই স্বনির্ভরতাগুলো হল : ক) খাদ্য সংগ্রহ বা আহরণ খ) পশুপালন, গ) খাদ্য উৎপাদন ঘ) কুটিরশিল্প।

উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের নাগা, লুসাই-কুকি সহ অন্যান্য উপজাতিদের মতই ত্রিপুরার উপজাতিরাও আদিম পদ্ধতিতে খাদ্য সংগ্রহ করে থাকেন। উচইরাও সেই নিয়মের বহির্ভূত নন। তাদের

(ক) খাদ্য সংগ্রহ বা আহরণ

খাদ্য সংগ্রহের জিনিষপত্র বা যন্ত্রাদি খুব কম। লোহার তৈরী 'দা কুবুই' (তাক্‌কল), বেতের তৈরী 'তুয়লাংগ' ও 'দিংগারা' (খাড়া)-ই প্রাথমিকভাবে তারা খাদ্য আহরণের কাজে ব্যবহার করে থাকেন।

জঙ্গল কাটা, মাংস কাটা থেকে আরম্ভ করে দা কুবুই বা তাক্‌কলকে সমস্ত কাজেই লাগানো হয়। 'তুয়লাংগা' দিয়ে সাধারণত লাকড়ি ও জলের কলস বহন করা হয় এবং 'দিংগারা' দিয়ে মাংসাদি বহন করা হয়ে থাকে।

অন্যান্য উপজাতিদের মত উচইদের জীবনেও শিকার অপরিহার্য অঙ্গ। শিকার তাদের খাদ্য আহরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্যও বটে। প্রাচীনকালে তারা তাদের খাদ্যের প্রয়োজন

শিকার

মেটাবার জন্যে যৌথভাবে নিয়মিত শিকারে বেরোতেন এবং শিকারে প্রাপ্ত মুইহান বা মাংস সবাই সমানভাবে ভাগ করে নিতেন। এমনকি কোন শিশু বা নারীকেও সেই সমানভাগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হত না। ত্রিপুরার বন পাহাড়ও এক সময় বাঘ, ভাল্লুক, হাতী, বনমহিষ, গবয়, হরিণ ইত্যাদি পশুতে পরিপূর্ণ ছিল এবং এ রাজ্যের উপজাতিরাও তখন মুক্ত পরিবেশে শিকারের পূর্ণস্বাদ উপভোগ করতেন।

উচইরা শিকারে তীরধনুক ব্যবহার করে থাকেন। তীরকে তারা 'পানসু' এবং ধনুকে

শিকারের অস্ত্রাদি

'পা' বলেন। এ ছাড়া তাদের শিকারের অন্যতম অস্ত্র হল লোহার তৈরী 'কল' বা বল্লম এবং বাঁশের তৈরী 'কলিংগ'। চার পাঁচ হাত বাঁশের একদিক চোখা করে এই 'কলিংগ' তৈরী করা হয়। কোন শিকার সামনে পড়লে 'কল' বা বল্লমের মত করে 'কলিংগ' ছুঁড়ে মারা হয় এবং লক্ষ্য সঠিক হলে শিকারের শরীরে তা শক্তভাবে বিদ্ধ হয়ে শিকার ধরা পড়ে।

তাদের শিকার পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের। এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য হল, কোন একজন বা কয়েকজন দক্ষ শিকারের অধীনে সমস্ত গ্রামবাসীরা একত্রে শিকারে বের হয়ে কোন বনাঞ্চলকে তারা শিকারের জায়গা হিসাবে বেছে নেন। দক্ষ শিকারী বা শিকারীরা বনের একদিকে অস্ত্রাদি নিয়ে শিকারের অপেক্ষায় প্রস্তুত থাকেন। অপরদিক থেকে বাকীরা হৈ হৈ রৈ রৈ করে শিকার তাড়াতে থাকেন। শিকারীদের সেরূপ সমস্বর চীৎকারে সেই বনাঞ্চলে অবস্থিত শিকারেরা ভয় পেয়ে নিজকে বাঁচানোর জন্য নিশ্চুপ জায়গা দিয়ে মুক্তাঞ্চলের উদ্দেশ্যে দৌড়তে থাকলে দক্ষ শিকারীদের খপ্পরে পড়ে। এমতাবস্থায় অনেক সময় শিকার ফসকে গেলে আবার দল বেঁধে শিকারের পেছনে পেছনে দৌড়তে থাকে এবং যতক্ষন শিকার হস্তগত না হয় ততক্ষণ এই তাড়া চলতে থাকে।

শিকার পদ্ধতি

কোন কোন সময় শিকারের খাদ্যান্বেষণের নির্দিষ্ট জায়গার অনতিদূরে কয়েকজন শিকারী চুপচাপ বসে থাকেন এবং শিকার আয়ত্তের ভেতরে এলে অস্ত্র ছুঁড়ে মারেন।

ব্যক্তি উপস্থিতির মাধ্যম ছাড়াও তারা ফাঁদ পেতে বনের পশু ও পাখী শিকার করে খাদ্য সংগ্রহ করে থাকেন। এই ফাঁদ তাঁরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে পেতে থাকেন। পদ্ধতি অনুসারে উল্লেখযোগ্য ফাঁদগুলির নাম হল—জে, বু-রা, বাতাচাউম, ডাকরাথাম ও মাংখুং।

ফাঁদ

'জে' ফাঁদ তৈরীর নমুনায় প্রথমত শিকারের যাতায়াতের রাস্তা বেছে সাত আট হাত বিশিষ্ট একটি বাঁশকে একটি গাছের সঙ্গে শক্তভাবে বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর সেই বাঁশের আগায় আরেকটি চোখা করা বাঁশ বেঁধে উভয়ের যুক্ত জায়গায় দড়ি বাঁধা একটি আংটা জড়িয়ে দেওয়া হয় এবং দড়িটি এমনভাবে উল্টোদিকে বাঁধা থাকে যাতে সমগ্র বাঁশটিই টানা অবস্থায় থাকে। চোখা অংশটা যাতে আবার মাটির দিকে ঝুঁকে না পড়ে তারজন্য দু'দিকে দুটো খুঁটি গেড়ে এক টুকরো বাঁশের দ্বারা সেতু বানিয়ে তার উপরে চোখা অংশটা সোজা রাখা হয়। সবশেষে প্রথমোক্ত বাঁধা বাঁশগুলির যুক্ত জায়গায় জুড়িয়ে দেওয়া আংটায় আরেকটি চিকন দড়ি বেঁধে চোখা অংশের সাথে সমান্তরাল ভাবে টেনে বন পশুর যাতায়াতের পথ ডিঙ্গিয়ে একটি খুঁটিতে বেঁধে দেওয়া হয়। কোন পশু সেই পথ দিয়ে যখন যাবে তখন চিকন দড়িতে বাঁধা পড়বে এবং চিকন দড়িতে সামান্য টান পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দড়ি সহ আংটিটি উপরে উঠে যায়। প্রথমোক্ত বাঁশটি তখন সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে দ্রুতগতিতে পশুর দিকে ধাবিত হয়ে চোখা অংশটা পশুর শরীরে বিদ্ধ হয়।

'জে ফাঁদ'

'বু-রা' ফাঁদ তৈরীর বেলায় প্রথমত তিনটি বাঁশকে সমান চার বা পাঁচ হাত করে কেটে ত্রিকোণ বানানো হয়। পরে আরো অনেক বাঁশ সমান করে কেটে মাঝের সামান্য জায়গায় বাদ রেখে ত্রিকোণের সমস্ত ফাঁক পূরণ করা হয়। তারপর সেই ভারী ত্রিকোণের দ্বিকোণ দিকটা মাটিতে লাগিয়ে একটু কাত করে বসিয়ে দেয়া হয়। একটি দড়িতে বাঁধা আংটা ত্রিকোণের মধ্যের ফাঁকা জায়গায় আট-

বু-রা' ফাঁদ

কানো থাকে এবং সে-ই ভারী ত্রিকোণের ভার ধরে রাখে। বলা বাহুল্য, আংটা বাঁধা দড়িটি একটি খুঁটিতে কিংবা গাছে বাঁধা থাকে। সবশেষে আংটার সঙ্গে এক টুকরা মাংস বাঁধা দড়ি মাটির দিকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। কোন পশু সেই ঝুলন্ত মাংসের লোভ সামলাতে না পেরে যেই মাংসে কামড় বসিয়ে টান মারে অমনি ত্রিকোণের সামান্য আটকানো আংটা খুলে যায় এবং ত্রিকোণটা পশুর উপরে পড়ে। ভারী বাঁশের ত্রিকোণের চাপে পশু হয় মারা যায় নয় মারাত্মক আহত অবস্থায় শিকারীর হাতে ধরা পড়ে।

'বাত্তাচাউম' ফাঁদ

'বাত্তাচাউম' ফাঁদ প্রথমত মাটিতে দেড় বা দুই ফুট গভীর গর্ত করা হয়। তারপর সেই গর্ত আবার গাছের ছোট ডাল, পাতা ইত্যাদি দিয়ে এমন ভাবে ভরাট করে রাখা হয় যাতে জায়গাটিকে স্বাভাবিক ধারণা করা যায়। সব শেষে গর্তের সোজাসুজি এক টুকরা মাংস ঝুলিয়ে রাখা হয়। কোন পশু ঝুলন্ত মাংস খেতে গেলেই গর্তের ভেতর পড়ে যায় এবং অনায়াসেই সেই পশু শিকারীর হস্তগত হয়।

'টাক্রাপাম'ও পশু ধরার ফাঁদ। 'মাংখু' এর সাহায্যে সাধারণতঃ পাখীই ধরা হয়ে থাকে। এছাড়াও আরো বিভিন্ন পদ্ধতিতে উচইরা শিকার ধরে থাকেন, যে পদ্ধতিগুলি সময় ও অবস্থানুযায়ী গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

মাছ শিকার

মাছ ও উচইদের খাদ্যের মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন কায়দায় তারা ছড়া বা নদীর মাছ ধরে থাকেন। ছড়া বা নদীর দু'দিকে বাঁধ দেয়ার পর বেতের তৈরী 'ফকহুউাই' দিয়ে সেখানকার জল পরিষ্কার করে মাছ ধরেন। অনেকে গভীর জলে হাতড়িয়েও মাছ ধরে থাকেন। আবার 'রুত' নামক বনের এক প্রকার শিকড়ের রস দিয়েও তারা নদীর মাছ ধরেন। অনেকগুলো 'রুত' গাছের শিকড় জড়ো করে ছড়া বা নদীর কোন জায়গায় চারদিকে বাঁধ দিয়ে প্রথমত মুগরের সাহায্যে শিকড় গুঁড়ো করে রস বের করেন। তারপর সব শিকড়ের রস বের করা হলে সেই বাঁধের জল ছেড়ে দেয়া হয়। সেই রসপূর্ণ জল তখন নদীর স্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়ে সব জলকে বিষাক্ত করে। নদীর মাছগুলি তখন সেই বিষাক্ত গ্যাস সহ্য করতে না পেরে উপরদিকে ভেসে উঠে এবং অপেক্ষারত মাছ শিকারীদের হাতে ধরা পড়ে।

প্রাচীনকালের মত উচইরা বর্তমানে আর শিকারে বেরোন না। কেননা সেই গভীর বন আজ আর নেই। এবং তখনকার মত প্রচুর বন্য জন্তুও আর বিচরণ করেনা যত্রতত্র। এছাড়া যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের অর্থনীতির মূল বনিয়াদও পরিবর্তিত হয়েছে অনেকদূর। তবে এখনও তারা সময় ও সুযোগ পেলে মাঝে মধ্যে দলবদ্ধ ভাবে শিকারে বেরিয়ে প্রাচীন ঐতিহ্য প্রকাশ করেন।

(খ) পশুপালন

কখন থেকে উচইরা পশুপালনে অভ্যস্ত হয়েছেন তার কোন সঠিক সময় নির্ধারণ করা না গেলেও সুদীর্ঘকাল থেকেই তারা পশুপালন করছেন একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করা যায়। মোরগ, ছাগল, শূকর ব্যতিত আধুনিক সমতল ভূমিতে স্থায়ী চাষবাসে অভ্যস্ত হওয়ার পর থেকে তারা গরু, মহিষ পালনও শুরু করেছেন।

অন্যান্য উপজাতিদের মতই উচইরা যে প্রথা'য় খাদ্য উৎপাদন করে থাকেন সেই প্রথা 'জুম' বলে পরিচিত। তাদের ভাষায় সে প্রথার নাম 'হুউ' বা 'হুক'। জুম চাষের

(গ) খাদ্য উৎপাদন কতকগুলি স্তর আছে। জুমিয়ারা ক্রমান্বয়ে সেই স্তর অনুযায়ী জুম চাষ করে থাকেন। যথা—(১) জায়গা নির্বাচন। (২) জঙ্গল কাটা (৩) টংঘর তৈরী (৪) শষ্য রোপণ (৫) শষ্য তোলা, ইত্যাদি।

জুম চাষের প্রথম থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত জুমিয়ারা নানাবিধ সংস্কার পালন করে থাকেন। বিশেষ করে কগবরক ভাষী বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর জুমিয়াদের পালিত নানাবিধ সংস্কারের মধ্যে প্রায় ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন জুমিয়ারা সাধারণতঃ বর্ষার পরেই সবুজ বনানীর বিভিন্ন পাহাড় ঘুরে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন চাষের জায়গা নির্বা-

১। জায়গা নির্ব্বাচন চনের জন্য। পছন্দমত জায়গা পেলে 'ওয়াখক' বা 'ওয়াখা' (একটি বাঁশের মাথায় আড়াআড়ি 'ক্রস' চিহ্নের মত আরও দু'খণ্ড বাঁশ এঁটে তৈরী) পুঁতে রাখা হয়। যাতে অপর কেউ এসে তার নির্বাচিত জায়গা দখল করতে না পারে। সমস্ত জুমিয়ারাই এই বিধি নির্দ্বিধায় মেনে চলেন। 'হাচুকমা' বা পর্বত সন্তানদের কাছে এ যেন এক অলিখিত সংবিধান।

'ওয়াখক' বা 'ওয়াখা' পুঁতে জায়গা নির্বাচনের পর উচইরা নির্বাচিত জায়গায় জুম চাষে পারিবারিক তথা সার্বিক মঙ্গল হবে কিনা এ বিষয়ে স্বপ্ন দেখে থাকেন। সুস্বপ্ন দৃষ্ট হলেই নির্বাচিত জায়গায় জুম চাষ চলে অন্যথায় ঐ জায়গার পরিবর্তে অনুসন্ধান চলে অন্য কোন পছন্দসই পাহাড়ের। সুস্বপ্ন দেখার পরেও 'তক' বা মোরগ বলি দিয়ে মোরগের নাড়িভুঁড়ি বের করে 'অচাই' বা ওঝা, সেমা বা বিদা দেখেন। 'সেমা' বা বিদা যদি ভাল হয় অর্থাৎ জুমদেবতা যদি সন্তুষ্ট হয় (ওঝার বিচারে) তবেই সেখানে জুম চাষ চলে অন্যথায় আবার জায়গা পরিবর্তনের প্রশ্ন দেখা দেয়।

এরপরই শুরু হয় জঙ্গল বা জুম কাটা। আগে বিস্তৃত জুমের পরিধির কাজ সময় মত শেষ করার লক্ষ্যে হেমন্ত আসার সাথে সাথেই জুম কাটা আরম্ভ হত। বর্তমানে

২। জঙ্গল বা জুম কাটা বাস্তব অবস্থার সংঘাতে জুমের পরিধিও ছোট হয়েছে বলে শীতকালেই সাধারণতঃ জুম কাটার কাজ শেষ হয়ে থাকে। জুম কাটার কাজ খুবই পরিশ্রমের বলে প্রত্যেক পরিবারের শুধু পুরুষেরাই যৌথভাবে একাজে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। পর্যায়ক্রমে প্রতি পরিবারের জুম কাটার কাজ শেষ হয়। শ্রম বিনিময়ের এই প্রথাকে কগবরক ভাষায় 'যাগুল খিললাইমানি' বলা হয়। নির্বাচিত জুমের নীচের দিক থেকে সাধাণতঃ জুম কাটা হয়ে থাকে। জুমের বাঁশ ও অন্যান্য গাছ গাছরাগুলিকে ঠিক গোড়ায় না কেটে মাটি থেকে কিছু উপরে কাটা হয়। কাটার পর সেগুলিকে আর কোনখানে না সরিয়ে সেখানেই রাখা হয় যাতে সেগুলিকে পোড়ালে ছাই থেকে সার পাওয়া যায়।

বসন্তের রৌদ্র-হাওয়ায় যখন কাটা বাঁশও গাছগুলি শুকিয়ে যায় তখন জুম পোড়ানোর কাজ শুরু হয়। সমস্ত জুম পোড়া শেষ হলে চলে 'হুক রুক' বা জুম পরিষ্কারের কাজ। আধ-

পোড়া টুকরাগুলিকে এক এক জায়গায় জড়ো করে জুম এলাকা চাষোপযোগী করা হয়। সেই সমস্ত আধপোড়া টুকরাগুলির অনেকটা আবার লাকড়ি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

তারপর এক শুভদিনে বাঁশ দিয়ে বানানো হয় গাইরিং বা টংঘর। টংঘর বানানো শেষ হলে বিগত বছরের টংঘর ছেড়ে বাসা বদল চলে নতুন জুমের টংঘরে। এভাবেই বছরের পর বছর চলে এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে বাসা বদল।

৩। গাইরিং বা টংঘর তৈরী

তারপর অপেক্ষা চলে এক পশলা বৃষ্টির। বৈশাখের প্রথম ভাগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলেই শুরু হয় জুম বোনার পালা। নারী পুরুষ নির্বিশেষে বাঁ কোমড়ে 'চেম্পাই' বা' কাসলেং (বেতের তৈরী ছোট খাড়া বিশেষ) বেঁধে ডান হাতে নেয় পুরানো দা বা 'দামরা'। সারি দিয়ে 'দামরা' ট্যারা করে এক দুই কোপ দেয় মাটিতে আর বাঁ হাত দিয়ে কিছু কিছু বীজ ফেলে দেয়। এই বীজগুলির মধ্যে থাকে ধান, কার্পাস, তিল, চালকুমোর, মিষ্টিকুমোর, জোয়ার, কাউন, শশা প্রভৃতি। বোনা হয় 'মাইছা' (বিভিন্ন প্রকারের খাবার ধান) 'মাইমি' (মদের ধান), 'গুইরামা' (পিঠে ধান)। নতুন শষ্য গজানোর পর 'উরিখুঙ' পূজা দেয়া হয় জুমের ফসল নষ্ট না হওয়ার অভীষ্ট লক্ষ্যে। ধান বোনার পর থেকে ধান না কাটা পর্যন্ত অন্ততঃ তিনবার জুম নিড়ানোর প্রয়োজন পড়ে। জুমের ফলাদি পাকবার আগে 'বালাকা' পূজা দিয়ে জুমের নতুন ফলগুলি আগে দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়। তারপরেই জুমের ফল খাওয়া চলে।

৪। শষ্য রোপণ

আগষ্টের শেষ দিকে জুমের ধান পাকা শুরু হয়। তখন ক্ষণে বৃষ্টি ক্ষণে প্রখর রোদ উপেক্ষা করে ফসল তোলার আনন্দে মেতে উঠেন সমস্ত জুমিয়ারা। জুমের ধান পাকা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই উচইরা 'মাইফাঙ থুফাঙ' পূজা দিয়ে থাকেন। ধান কাটা শেষ হওয়ার পরও তারা 'মাইকুম' পূজা দেন। উভয় পূজাতেই মোরগ বলি দেয়া হয়ে থাকে।

৫। শষ্য তোলা

জুমের সমস্ত ধান তোলা হলে ঘরে ঘরে চলে 'মায় কাতাল' বা নবান্নোৎসব। রনতক বা রন্দক বা লক্ষী পূজা দেওয়ার মাধ্যমে নবান্নোৎসব শুরু হলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে মেতে উঠেন মদ্যপানে ভূরিভোজে। গানে, নাচে, হাসিঠাট্টার জোয়ারে জেগে উঠে উচই গাঁও।

আধুনিক সমতল চাষীদের সান্নিধ্যে এসে উচইরা বর্ত্তমানে বহুলাংশেই কৃষিকাজের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। তাই তাদের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও পারিপার্শ্বিক আধুনিক পরিবেশকে ঘিরে। জুম চাষ তারা প্রায় আস্তে আস্তে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এছাড়া জুম চাষের সেরকম জায়গাও প্রায় নেই বলে অনেককে বাধ্য হয়ে জুম চাষে বিরত থাকতে হচ্ছে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, একসময় ঘন আগাছা ও কাঁটা গাছ গাছরাদি কেটে সমস্ত উচইরাই কৃষিযোগ্য সমতল জায়গা যোগার করে কৃষিকাজে মনোযোগ দিলেও অনভিজ্ঞতা হেতু কিংবা অর্থনৈতিক প্রাতিযোগিতায় হেরে গিয়ে আজ অনেকেই ক্ষেত মজুর ও দিন মজুরে পরিণত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, তাদের এই পরিণতির জন্য গ্রাম্য সুদখোর মহাজনরাও অন্যতম দায়ী। অজ্ঞ ও গরীব

সমতল চাষ

কৃষকদের অর্থ নৈতিক দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে চড়া সুদে টাকা দিতে দিতে একসময়ে তাদের কৃষিযোগ্য জমি বেচতে বাধ্য করে এবং ধীরে ধীরে সমস্ত জমিই মহাজনদের হস্তগত হয়ে যায়। ঐ সমস্ত কৃষকরাই আজ অর্থ নৈতিক পঙ্গুতায় ভুগছেন। বন থেকে বাঁশ, ছন, লাকড়ি যোগার করে সাংসারিক খরচ যোগানই তাদের একমাত্র সম্বল। আবার সরকারের সংরক্ষিত বনাঞ্চল বেড়ে যাওয়ার ফলে এবং সাথে সাথে বাঁশ, ছন, লাকড়ির, দুষ্প্রাপ্যতাও বেড়ে যাওয়ায় বর্ত্তমানে তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে ওদের দিন কাটে। এ চিত্র শুধু উচই সমাজেই সীমাবদ্ধ নয়, ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতিদের যথা ত্রিপুরী, জমাতিয়া, রিয়াং কাইপেং মলছম প্রভৃতির সমাজে ও সম প্রতিফলিত।

আশার কথা, বর্ত্তমানে সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সময়ে সময়ে এন, আর, ই, পি, ও এস, আর, ই, পি'র কাজ করিয়ে এবং উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে ল্যাম্পসের মাধ্যমে খোরাকী ঋণ সহ বিভিন্ন ঋণ দিয়ে—ধীরে ধীরে জুমিয়া ও উপজাতি দিনমজুরদের স্বনির্ভর করার মহতী প্রচেষ্টা নিচ্ছেন। এই বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য। তবে এক্ষেত্রে বর্ত্তমানে কিছু ঘাটতি দেখা দিলেও এক সময়ে তা দূরীভূত হবে না একথা অবশ্যই ঠিক নয়।

রাজ্যের অন্যান্য উপজাতিদের মতই উচইদের প্রত্যেক পরিবারই যেন এক একটি শিল্প কারখানা। কুটির শিল্পের মাধ্যমে তারা যে সমস্ত জিনিষ উৎপাদন করে থাকেন সেই সমস্ত জিনিষ সাধারণতঃ নিজের এবং পরিবারের প্রয়োজনেই লাগে। বাঁশ ও বেতের তৈরী বিভিন্ন জিনিষ এবং তাঁতে বোনা বিভিন্ন কাপড় চোপড় বাজারে পাওয়া প্রায় দুষ্কর বললেও চলে। যেহেতু নিজেরাই অবসর সময়ে সে সমস্ত জিনিষ তৈরী করে থাকেন বলে সেগুলোর বাজারজাত করার কোন প্রশ্নই উঠে না। তাই উচই তথা উপজাতিদের কুটির শিল্পে প্রতিযোগিতার তেমন ছোঁয়া নাই বললেও চলে। একথা উল্লেখ্য যে তাদের সেই শিল্পের জন্য কাঁচামাল ক্রয়ের প্রশ্নও জড়িত নেই। বনজাত বাঁশ ও বাঁশ থেকে বেত এবং জুমে প্রাপ্ত তুলাই তাদের শিল্পের প্রয়োজন মেটায়। উচই বিকলাঙ্গ এবং কঠিন পরিশ্রম করার ক্ষমতা যারা হারিয়ে ফেলেন তারা সাধারণতঃ বাড়ীতে বসে বাঁশ-বেতের কাজে মনোনিবেশ করেন এবং নিজেদের মধ্যেই সেগুলো বেচে নিজেদের খাবার ও চলার পয়সা যোগাড় করে থাকেন।

(ঘ) কুটীর শিল্প

বন ও বাশের পরিবেশে উচই তথা উপজাতিরা বর্দ্ধিত বলে বাঁশ প্রতিক্ষেত্রেই তাদের অপরিহার্য। বাঁশ ও বেতের তৈরী বিভিন্ন জিনিষেই তাদের বাড়ীঘর সাজানো হয়ে থাকে। জিনিষপত্র বহন করা থেকে আরম্ভ করে মাছ ধরার, ধান মাপার, কাপড়চোপড় রাখার সমস্ত জিনিষই তাদের বাঁশ-বেতের তৈরী। দূরবর্তী জায়গায় বিভিন্ন জিনিষপত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্য তারা 'নগাই' ও 'দিংগারা' ব্যবহার করেন এবং জলের কলস ও লাকড়ি বহনের জন্য 'তুয়-লাংগো' কাজে লাগান। জুমে শষ্য রোপণের সময় 'কাইছনি' ও 'চেম্পাই' ব্যবহার করে থাকেন। বাড়ীঘরে মূল্যবান জিনিষ ও কাপড়চোপড় রাখার জন্য 'বথক', 'চাপা' ইত্যাদি

বাঁশ-বেতের শিল্প

ব্যবহৃত হয়। বীজধান রাখার জন্য 'থউ' এবং 'মৌং' ও ঢোলে ধান রাখা হয়। চাল রাখার জন্য তোং বানানো হয়। মাপক যন্ত্র হিসাবে তন ব্যবহৃত হয়। 'বাইলেং' এর দ্বারা তুষ ঝাড়া হয় এবং 'বাইলেংখু'তে জিনিষপত্র শুকানো হয়। মাংস, বাঁশকুড়ুল ইত্যাদি শুকানোর জন্য পাতলা বেতের দ্বারা 'চাংমি' তৈরী করা হয়। মাছ ধরার যন্ত্র হিসাবে 'ফকহুটাই' 'সানাম' ইত্যাদি বানানো হয় এবং বসার জন্য 'জাংথাই', 'জামফ্রা' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। যুবক যুবতী এবং নবদম্পতীদের ব্যবহৃত জিনিষ রাখার জন্য 'খেড়ু' বানানো হয়ে থাকে। এছাড়াও তারা 'সিমবু' বা আলনাও ব্যবহার করে থাকেন।

একথা উল্লেখ করবার প্রয়োজন যে, বাঁশ-বেতের কাজ সাধারণতঃ পুরুষরাই করে থাকলেও অনেক অভ্যস্ত মহিলাও একাজে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। অনেক পরিবারের স্ত্রীলোকেরা একাজে পুরুষদের সমান দক্ষ থাকেন তবে মেয়েদের বেলায় বাঁশ-বেতের কাজ না জানা কোন দোষের না হলেও পুরুষরা এ কাজে অজ্ঞ থাকলে 'পংগা' আখ্যা পায় এবং বিবাহাদির বেলায় মেয়ে যোগাড় করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রত্যেক ছেলেকেই জৈবিক ও বাস্তব প্রয়োজনে একাজে দক্ষতা অর্জন করতে হত। এমন কি একাজে সুদক্ষ ব্যক্তির সমাজে এক সময় আলাদা কদরও ছিল। তাই বাঁশ-বেতের কাজে সুদক্ষ প্রতিপন্ন করার একটা নীরব প্রতিযোগিতা সমাজে পরিলক্ষিত হয়।

অন্যান্য উপজাতিদের মতই উচইরা খুব সরল জীবনযাপন করে থাকেন বলে তাদের পোষাকের তেমন বাহুল্যও নেই। পুরুষদের নিম্নাংগে ব্যবহারের জন্য 'কাঁদা' এবং উচ্চাঙ্গের জন্য 'খুতাইতাক বরক' (জামা বিশেষ), মেয়েদের পরনের 'রিগনাই' বা পাছড়া, বক্ষাভরণের জন্য 'রিসা' সহ নিজেদের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষই তারা নিজস্ব 'খানতি' বা কোমড় তাঁতে তৈরী করে থাকেন। প্রাচীণকালে সমস্ত উচই তথা উপজাতি রমণীরাই একাজে অংশ গ্রহণ করে থাকতেন। শিশুকাল থেকেই উপজাতি মেয়েদের তাঁত শিক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। তাঁত শিল্পে অজ্ঞ মেয়েদের রীতিমত 'পংগি' আখ্যায় আখ্যায়িত করা হত। সেইরূপ পংগি মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার বেলায় বাবা-মা খুবই বিপদের সম্মুখীন হতেন বলে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনেই অতি অল্প বয়স থেকেই 'রিকথে'র মাধ্যমে (তাঁত বোনা শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ কায়দা। কোমড় তাঁতের অনুরূপ হাত দেড়েক সুতার দ্বারা ছোট কোমড় তাঁত বানিয়ে ছোট মেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া হত। বড়দের দেখাদেখি ছোট মেয়েরাও খেলাচ্ছলেই এ শিক্ষায় শিক্ষিত হত) মা বা মাতৃসদৃশ্যরা কাপড় বোনা শিক্ষা দিতেন।

তাঁত শিল্প

তাঁত শিল্প সংশ্লিষ্ট সমস্ত যন্ত্রই তাদের বাঁশের তৈরী। এমন কি সুতার মতন কাঁচামালও তাদের বাজার থেকে কেনার প্রশ্নই ছিল না। জুমে উৎপাদিত কার্পাস থেকেই তারা নিজস্ব কায়দায় সুতা প্রস্তুত করতেন। তবে ইদানিং বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক কারণে জুমচাষের বিস্তীর্ণ জায়গা নেই বলে তুলার উৎপাদনও অতিমাত্রায় কমে গেছে। তাই বর্ত্তমানে তাদেরকে সুতা সংগ্রহের জন্য বাজার মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে। আবার বাজার থেকে সুতা সংগ্রহের সাথে পয়সার প্রশ্নও জড়িত বলে বর্ত্তমান কঠিন বাস্তবের সাথে সংগ্রামে তারা প্রায় হেরে গিয়ে ধীরে ধীরে গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন নিজস্ব তাঁত।

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক কাঠামো ও প্রথা

শারীরিক বৈশিষ্ট্য

উচইরা সাধারণত হলুদ পিঙ্গল অথবা হালকা পিঙ্গল বর্ণের। অন্যান্য মঙ্গোলিয়ানদের মতই তারা পেশীবহুল সুঠাম শরীর, প্রশস্ত মাথা, গোলাকৃতি মুখ, পুরু ঠোঁট, ছোট চোখ, বোটা নাক ও খারা কালো চুলের অধিকারী। তাদের শরীরে লোম ও দাঁড়িগোঁফ খুব কমই থাকে। পুরুষনারী নির্বিশেষে তারা কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা রাখেন। পুরুষ উচইরা লম্বায় মাঝারী আকারের। মেয়েরা তুলনামূলকভাবে পুরুষদের চাইতে একটু বেটে।

আভ্যন্তরীন শাখা

উচইরা প্রধানতঃ বারটি গোষ্ঠি বা শাখায় বিভক্ত। যথাঃ—(১) পাইকতমা (২) খেয়াং (৩) জলাই (৪) উাকচু (৫) উারেং (৬) চংপ্রাই (৭) কাইছনি (৮) তকমা য়াকচ (৯) তুয়মুধ য়াক্ফা (১০) জলাই কাঁচাক (১১) জলাই কসম (১২) সিকাম পাইনজি। অনেক বয়স্ক উচইদের মতে পাইকতমা, খেয়াং ও জলাই তিন প্রশাখার উচইরাই ত্রিপুরাতে বর্ত্তমান। বাকীরার অস্তিত্ব এ রাজ্যে নেই বললেও চলে।

পারিবারিক সংগঠন

বৈবাহিক সূত্রানুযায়ীই উচইদের পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। প্রত্যেক উচই পরিবারের কেন্দ্রস্থলেই বাবা-মা থাকেন। বাবা মাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে তাদের গোষ্ঠী ও সমাজ। আভ্যন্তরীণ প্রত্যেক গোষ্ঠী বা শাখার মধ্যেই তাদের প্রত্যেকের বিবাহরীতি প্রচলিত আছে। এরূপ ক্ষেত্রে ছেলে সন্তানেরা বাবার গোষ্ঠী বা শাখার পরিচয়ে পরিচিত হয় আর মেয়ে সন্তানেরা মার গোষ্ঠী বা শাখার পরিচয়ে পরিচিত লাভ করে। আরো পরিষ্কারভাবে বলা চলে, পাইকতমা গোষ্ঠী বা শাখার কোন ছেলের সঙ্গে খেয়াং গোষ্ঠী বা শাখার কোন মেয়ের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে তাদের সন্তানদের মধ্যে ছেলে সন্তানেরা পাইকতমা ও মেয়ে সন্তানেরা খেয়াং গোষ্ঠী বা শাখা হিসাবে পরিচিত হয়। এতে কিন্তু তাদের পারিবারিক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। প্রত্যেক পরিবারের সদস্যই অর্থনৈতিক কাজ, যথা—খাদ্য আহরণ, খাদ্য উৎপাদন, বস্ত্র তৈরী ইত্যাদি কাজে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। বলা বাহুল্য, বাবা-মা'র নেতৃত্বে যৌথভাবেই এ সমস্ত কাজ হয়। পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা থেকে আরম্ভ করে সমাজে প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি পরিবারের কর্ত্তা হিসাবে বাবাই করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে বাবার কর্মক্ষমতা হারিয়ে গেলে কিংবা মারা গেলে বড় ছেলেরা এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সাধারণতঃ তিন পুরুষ পর্যন্ত উচইরা যৌথ পরিবারভুক্ত থাকলেও বর্ত্তমানে এ ধরণের বড় পরিবার দেখা যায় না বললেও চলে।

উচইদের গোষ্ঠী সম্বন্ধ প্রাথমিকভাবে পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে নিজেদের বংশ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, তাদের মধ্যে নিকট আত্মীয় বিয়ের রীতি

প্রচলিত নেই। এর জন্যেই মার ভাই বা বোনের মেয়ে অথবা বাবার ভাই বা বোনের মেয়ে আত্মীয়তার সম্বন্ধ বিধায় বাবা মার ভাই বা বোনের ছেলের বিয়ে হয় না। এই নিয়ম ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতি, যথা, ত্রিপুরী, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, কাইপেং, গারুদের মধ্যেও প্রযোজ্য।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক

উচইদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক সাধারণতঃ যৌথ পরিবারের নিয়ম অনুযায়ীই প্রচলিত। এক ঘরে থাকা, খাওয়া, ঘুমানো সবার ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক রেওয়াজ। এমন কি নব দম্পতিদের জন্যও আলাদা কোন ঘর বা কক্ষের ব্যবস্থা থাকে না। এর ফলে তাদের স্বাধীন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কঠিন হলেও পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য কিংবা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় না। নির্দ্বিধায় শ্রম বিভাজনের নীতি মেনে তারা ঐতিহ্যের ধারা বজায় রাখেন। স্ত্রী কাজে গেলে ছেলেমেয়ে দেখাশুনা থেকে আরম্ভ করে রান্নাবান্নার কাজও স্বামীর দ্বারা হয়ে থাকে।

বাবা মা'র সঙ্গে ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক

পরিবারের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নিয়মেই বাবার হাতে বর্ত্তায়। এই নিয়ম ছেলেমেয়ে বড না হওয়া পর্য্যন্ত বজায় থাকে। বিয়ের পর ছেলেমেয়ে স্বনির্ভর বিবেচনায় ভিন্ন হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই ছেলেমেয়েরা নিজের কর্তৃত্বে সংসার চালায়। নিজ নিজ ছেলেমেয়েদের বাড়িয়ে তুলার কাজ সমভাবেই বাবা মা করে থাকেন। এখানে একটা কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন যে, ছেলে সন্তানেরা সাধারণতঃ শিশুকাল থেকেই বাবার অধীনে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপ, যথা : শিকার, বাঁশবেতের কাজ, চাষ ইত্যাদির শিক্ষা নিয়ে থাকে। অপরদিকে মেয়েরা মা'র অধীনে থেকে জল আনা, রান্না করা, কাপড় বোনা, শিশুদের দেখাশুনার কাজ শিখে থাকে।

স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে পরিবারের বড়জনদের সম্পর্ক

প্রায় সমাজেই আত্মীয়তার সম্বন্ধ সামাজিক নিয়মানুসারে প্রচলিত। কোন পরিবারের স্বামী স্ত্রীই তাদের বড়জনদের নাম ধরে ডাকেন না। বিশেষ করে শশুর, শাশুরী, খুড়োখুড়ী বড় ভাই, বড় বোন ইত্যাদিদের স্বামী স্ত্রীরা সমীহ করেই চলেন এবং প্রয়োজন ব্যতিরেকে কথাবার্ত্তা বলেন না। রান্না, পরিবেশনে কোন রকম বাধা না থাকলেও পরিবারের বড়জনদের বিশেষ করে স্বামীর বড় ভাই কিংবা স্ত্রীর বড় বোনদের ছুঁয়ার নিয়ম উচই সমাজে পরিলক্ষিত হয় না।

স্বামি স্ত্রীর সঙ্গে পরিবারের ছোটদের সম্পর্ক

পরিবারের ছোটদের সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বড়জনদের সঙ্গে সম্পর্কের সম্পূর্ণ বিপরীত থাকে। স্বামীর ছোট ভাইবোন বা স্ত্রীর ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর সহসা বাক্য বিনিময়, হাসি—ঠাট্টা, হালকা কথাবার্ত্তা ইত্যাদিরও বিনিময় হয়। স্ত্রী মারা গেলে অনেক স্বামী স্ত্রীর ছোটবোনকে বিয়ে করার প্রমাণও পাওয়া যায়। বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যেও এ রেওয়াজ প্রচলিত আছে। এমনকি দেবর কথাটিও দ্বি—বর মানে দ্বিতীয় বর শব্দজাত বলেই পণ্ডিতদের অভিমত।

উচইরা নিজেদের ভাষায় আত্মীয়তা সম্বোধন করে থাকলেও তাদের অনেক শব্দই বাংলা থেকে গ্রহণ করা। ত্রিপুরার কগবরকভাষী অন্যান্য উপজাতিরাও বাংলা শব্দ গ্রহণ করা থেকে মুক্ত নয়।

নীচে বাংলা অর্থ সহ ত্রিপুরী ও উচইদের আত্মীয়তা সম্বোধনের তালিকা দেয়া হল :

বাংলা	ত্রিপুরী	উচই
প্রপিতামহ	বাকৃতর	য়ং চৗলা
প্রপিতামহী	মাকতর	য়ং বৗরৗয়
পিতামহ	চুচু বা দাবুড়া বা দাদু	চুচু
পিতামহী	নানা বা আচুই	আচুই
পিতা	ফা অথবা বা	ফা অথবা পা
মাতা	আমা অথবা মা	আমুং
জ্যেঠা	আয়ুং অথবা জেঠা	আয়ুং
জ্যেঠাইমা	আয়ুং বৗরৗয় অথবা য়ং বৗরৗয় অথবা জেঠী	আয়ুং বৗরৗয়
মামা (মার বড়)	য়ং চৗলা অথবা মামা	মামা
" (মার ছোট)	মামা	মামা
মামী (মার বড়)	য়ং বৗরৗয় অথবা মামী	আতয়
মামী (মার ছোট)	মামী	আতয়
মেসো (মার বড়)	মুড়া অথবা য়ং	মামা
" (মার ছোট)	মুড়া	ঐ
মাসী (মার বড়)	য়ং বৗরৗয় অথবা মই	আতয়
" (মার ছোট)	মই	ঐ
কাকা	কাকা	মামা
কাকী	কাকী	আতয়
পিসা (বাবার বড়)	পিয়া অথবা য়ং চৗলা	আয়ুং
" (বাবার ছোট)	পিয়া	মামা
পিসী (বাবার বড)	পি অথবা য়ং বৗরৗয়	আয়ুং
" (বাবার ছোট)	পি	আতয়
শ্বশুর	কৗরা	কৗরায়
শ্বাশুরী	কৗরাজুক	কৗরায়ং
সৎবাবা	ফাতয় অথবা কতয়	ফাকতয়
সৎমা	মাকতয়	মাকতয়

বাংলা	ত্রিপুরী	উচই
বড় ভাই	দাদা	আতা
ছোট ভাই	কুকুই বা ফায়ুং	ফায়ং
বড় বোন	বায়	আবি
ছোট বোন	হানক	হানক
বৌদি	বাচুই	বাচুই
ছোট ভায়ের স্ত্রী	উাইজুক	উাইজুক
জামাইবাবু	কুমুই	কুমুই
ছোট বোনের জামাই	উাই	উাই
স্বামী	সাই	সাই
স্ত্রী	হিক	হি
সম্বন্ধী	উাই	উাই হকরা
সম্বন্ধীর স্ত্রী	বাচুই	বাচুই
শ্যালক	পারাও	মপারাওরুহা
শ্যালীকা	পারাওজুক	মপারাওযুকমা
ভায়রা	কুমুই	কুমুই
ভাসুর	উাই	উাই
জা	বাচুই	বাচুই
দেবর	পারাও	পারাও
ননদ	উাইজুক	উাইয়ুক
ভ্রাতুষ্পুত্র	বাতিজা	বাতিজা
ভাগনে	বাগিনা	বাগিনা
কন্যা	সাজুক	সাজুক
বেহাই	চামাই	চামাই
বেহাইন	চামাইজুক	চামাইযু
নাতি	সুক	মুইসু
পুতিন	পুতিন অথবা বরা	বরা

তালিকা লক্ষ্যে দেখা যায় ত্রিপুরীরা প্রপিতামহ ও প্রপিতামহীকে বা কতর ও মা কতর সম্বোধন করলেও উচইরা যথাক্রমে য়ং চালা ও য়ং বীরায় সম্বোধন করে থাকেন। মামা কাকা, মেসো পিসাদের তারা 'মামা' সম্বোধনই করেন। এছাড়া অন্যান্য সম্বোধনগুলির বেলায় ত্রিপুরীদের সাথে উচইদের তেমন পার্থক্য দেখা যায়না।

স্বামী স্ত্রীরা কখনো কারো নাম উচ্চারণ করেন না। পরস্পরের মধ্যে তাঁরা 'হুও' মানে 'তুমি' সম্বোধন করে থাকেন। ছেলে বা মেয়ের বাবা বা মা হলে অমুকের বাপ বা অমুকের মা সম্বোধনে পরস্পর ডাকেন। অন্যের সঙ্গে আলাপের সময় স্বামী বা স্ত্রীর প্রসঙ্গ উঠলে অমুকের বাপ বা অমুকের মা বলে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়।

খাদ্য ও পানীয়

অন্যান্য উপজাতিদের মতই উচইদের খাদ্যও খুব সাধারণ। তাদের পরিবেশ ও অর্থ নৈতিক সংগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এই খাদ্যাভাস গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখ্য করা যায় যে, পৃথিবীর যে কোন জাতি গোষ্ঠীর খাদ্যাভাসই নিজস্ব পরিবেশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। তাই বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে বর্দ্ধিত ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর খাদ্য ভিন্ন রকমের। কঠিন পরিশ্রমে অভ্যস্ত উচইরা সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যা চব্বিশ ঘণ্টায় তিনবার খেয়ে থাকেন। বলা বাহুল্য, এই খাদ্যের মধ্যে ভাতই প্রধান। তরকারী হিসাবে বাঁশ করুল,, বন আলু, বন-পশুর মাংস, মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি খেয়ে থাকেন। তিন প্রধান পদ্ধতিতে তাদের এই খাদ্য চলে। যথা—(১) সেদ্ধ (২) পোড়া ও (৩) সেঁকা।

খাদ্য

(১) সেদ্ধ ভাতের সঙ্গে বিভিন্ন রকমের সেদ্ধ তরকারী তারা খেতে অভ্যস্ত। সেদ্ধ তরকারীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (ক) গদক বা গুদক (খ) বুতুয় (গ) আওয়ানচুরু বা পিঠালি এবং (ঘ) চাখুরু।

(ক) গদক বা গুদক—কাঁচা তরকারীগুলিকে কুচি কুচি করে কেটে একটি বাঁশের চোঙ্গে লবন, মরিচ ও সিদল দিয়ে ভরে উপরে পরিমানমত জল ঢেলে দেয়া হয়। তারপর চোঙ্গের মুখ ভাল করে কলাপাতা দিয়ে বন্ধ করে জ্বাল দেওয়া হয়। আগুনের তাপে গরম হয়ে চোঙ্গের তরকারী ফুটতে ফুটতে মুখ বন্ধ করা পাতাগুলিকে উপরের দিকে ঠেলতে থাকলেই বোঝা যাবে তরকারি সেদ্ধ হয়ে গেছে। তারপর চোঙ্গটি ঠাণ্ডা জায়গায় সরিয়ে আরেকটি ছোট অথচ শক্ত বাঁশের ডাণ্ডা দিয়ে ভিতরের তরকারিগুলিকে গুঁড়া করা হয়। চোঙ্গের সমস্ত তরকারী গুড়া হয়েছে মনে হলে সমস্ত তরকারিগুলিকে একটি পাত্রে ঢেলে চোঙ্গটি ফেলে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির রান্নাকে স্থানীয় বাংলা ভাষায় 'চোঙ্গা গুটানি' ও বলা হয়ে থাকে। মাছ, মাংস ছাড়া সাধারণত: বাঁশ করুল, বিভিন্ন রবিশষ্য এই পদ্ধতিতে রান্না হয়ে থাকে। তবে স্বাদ বৃদ্ধির জন্য অনেক সময় গুঁড়া মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি তরকারীর সাথে দেয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে গদক রান্নার পদ্ধতিরও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বাঁশ-পরিবেশ থেকে দূরে যাঁরা থাকেন বিশেষ করে শহরবাসীরাই আধুনিক পদ্ধতিতে গদকরান্নার দাবীদার। আধুনিক পদ্ধতিতে চোঙ্গের পরিবর্তে এলুমিনিয়ামের ডেকে বা করাইতে লবন, মরিচ ও সিদল সহ তরকারী দিয়ে সামান্য জল মিশিয়ে জ্বাল দেয়া হয়। উপরে অবশ্যই ঢাকনা থাকে। তরকারি সেদ্ধ হয়ে গেলে ঝোলগুলি আলাদা পাত্রে ঢেলে কিংবা শুধু তরকারিগুলি আলাদা পাত্রে তুলে সামন্য

মাখা হয়। মাখবার সময় সামান্য পেঁয়াজও কুচি কুচি করে কেটে দেয়া হয়ে থাকে।

(খ) বুতুয়—ঝোল। কাঁচা তরকারির সাথে জল মিশিয়ে লবন, মরিচ ও সিদল দিয়ে এলুমিনিয়ামের ডেক বা করাই চাপিয়ে জ্বাল দেয়া হয়। তরকারী সেদ্ধ হলে নামিয়ে ভাতের সাথে মেখে খাওয়া চলে। কাঁচা তরকারি ছাড়া অনেক সময় শুধু পরিমাণমত জলে সিদল, লবন ও মরিচ সহ ঝোল সেদ্ধ হয়। এই পদ্ধতির স্থানীয় নাম 'বেরমা বুতুয়' বা সিদল ঝোল।

(গ) আওয়ানচুরু বা পিঠালি রান্নার পদ্ধতি প্রায় 'বুতুয় রান্নার মতই। শুধু তরকারি নামানোর আগে পরিমাণমত আতপ চাল বেঁটে তরকারীতে ফেলে নাড়া দিলেই চলে। বর্ত্তমানে কেউ কেউ সুগন্ধের জন্য রসুন ছেঁচে দিয়ে থাকেন।

(ঘ) 'চাখুয়' এর স্থানীয় বাংলা 'ক্ষারপানি'। প্রথমে বাঁশ-কয়লাগুলিকে বেতের তৈরী তিন কোন বিশিষ্ট একটি পাত্রে নিয়ে উপরদিক থেকে জল ডালা হয়। কয়লার সাথে সেই জল মিশে ক্ষার তৈরী হয় এবং ঐ ক্ষার-জলই তরকারির ঝোল হিসাবে কাঁচা তরকারির সাথে মিশিয়ে জ্বাল দেয়া হয়। বলা বাহুল্য লবন, মরিচ ও সিদল সব পদ্ধিতির রান্নাতেই প্রযোজ্য। বিশেষ করে শক্ত বা শুকনো তরকারিগুলিকেই 'চাখুয়' রান্না হয়। আবার অনেক সময় তরকারি না মিশিয়েও শুধু ক্ষার জল দিয়েই তরকারি রান্না করা হয় থাকে। বর্তমানে অনেকেই বাজার থেকে সোডা সংগ্রহ করে ক্ষার জলের অভাব পূরণ করে থাকেন।

উচইরা বাদেও এ রাজ্যের দেববর্মা, রিয়াং জমাতিয়া প্রভৃতি উপজাতিদের উল্লিখিত গদক বুতুয়, আওয়ানচুরু, ও চাখুয় বিশেষ প্রিয় খাদ্য। এখানে উল্লেখ করা মোটেই অত্যুক্তি নয় যে, আগরতলা শহরবাসী দেববর্মারা অনেকেই নিজেদের ভাষা ভুলে গেলেও উল্লিখিত পদ্ধতিতে রান্না করা তরকারি খেতে মোটেই ভুলে যাননি।

(২) পোড়ে খাওয়া সম্পূর্ণ আদিম পদ্ধতি। মাছ, মাংস, বনআলু প্রভৃতি পোড়া দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস এখনও উপজাতিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে 'ভর্তা' করার পদ্ধতিতে মরিচ ও সিদল অবশ্যই পোড়া দিতে হয়।

(৩) সেঁকে খাওয়াও আদিম পদ্ধিতির অন্যতম। এই পদ্ধতি আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে অনেকটা লুপ্ত হয়ে গেলেও মাংসাদির বেলায় 'সিঁক' গেথে রেখে খাওয়ার পদ্ধতি চোখে পড়ে।

সমতল বাঙ্গালীদের সান্নিধ্যে এসে উচইরা বর্তমানে তেল, মশলাদি সহ রান্নার পদ্ধতি আয়ত্বে আনলেও অন্যান্য উপজাতিদের মতই খুব কম মশলা পছন্দ করেন। আধুনিক প্রাপ্য সমস্ত খাদ্য উপকরণই তারা বর্তমানে খেয়ে থাকেন।

প্রায় সমস্ত উচইরাই ধূমপানে অভ্যস্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। নারীপুরুষ নির্বি-শেষে অন্যান্য উপজাতিদের মতই তারা ধূম পান করেন। প্রত্যেকের ঘরেই বাঁশের তৈরী

হুঁকা থাকে। কাজের ফাঁকে বিশ্রামের সময় তারা আয়েস করে ধূমপান করেন। বিভিন্ন আলাপের সময়, বিবাহোৎসব এবং পূজাপার্বনে ধূমপান তাদের অপরিহার্য্য। বন্ধু-বান্ধব কিংবা ঘরে অতিথি এলে প্রথমেই তারা হুঁকায় ধূমপানের অভ্যর্থনা জানান। ধূমপান রেখে ঢেকে কিংবা লুকিয়ে খাওয়ার নিয়ম তাদের মধ্যে নেই। তারা বাবা-মা, ছেলে বুড়ো একত্রে নির্দ্বিধায় ধূমপান করে থাকেন।

ধূমপান

বর্ত্তমানে অনেকেই বিড়ি সিগারেট খাচ্ছেন। আধুনিক শিক্ষিত ছেলেরা বাঙ্গালীদের সংস্পর্শে এসে অনেক সময় সমীহ করে বাবা মা বা গুরুজনদের সামনে বিড়ি সিগারেট খাওয়া থেকে বিরত থাকতে চান।

মদ্যপান উচই তথা উপজাতি জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পূজাপার্বন, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে মদ প্রদান আবশ্য কর্ত্তব্য বিধায় সমস্ত উচইরাই মদ্যপানে অভ্যস্ত। ধূমপানের মতই মদ্যপানেও তাদের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। নিঃসন্দেহে গুরুজনদের সঙ্গে একত্রে মদ্যপান সামাজে প্রচলিত।

পানীয়

তবে আজকাল সে সব প্রথা উঠে যাচ্ছে। খৃষ্টানদের সংস্পর্শে এসে অনেকেই খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে ঐতিহ্যগত সামাজিক প্রথার অনেক দূরে চলে যাওয়ায় বিভিন্ন পূজাপার্বন ও উৎসব অনুষ্ঠানে মদ্য প্রদানের প্রথা লুপ্ত হওয়ার সা.থ সাথে অনেক উচই পাড়াতেই মদ্যপান একেবারে চলে না।

দ্বিতীয়ত, সামান্য রোগেও বর্ত্তমানে আধুনিক চিকিৎসার শরণাপন্ন হওয়ার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সেকেলে প্রথায় দেবতা কিংবা অপদেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মদ্য নিবেদনার্থে ঘরে ঘরে মদ বানানোর প্রয়োজনবোধ কমে গেছে। তাই যখন তখন ঘরে অতিথি এলে অতিথির সম্মানার্থে মদ্যপানে বসে যাওয়ার নিয়ম আর নেই বললেও চলে। তাছাড়া অর্থ-নৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে যাওয়ার ফলেও অনেককে বাধ্য হয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যের অনেক দূরে চলে যেতে হচ্ছে।

উপরন্তু অনেক শিক্ষিত ছেলের মদ্যপানের কুফলতা সম্বন্ধে সচেতনতার প্রত্যক্ষ ফল সমাজে প্রতিফলিত হওয়ার কারণেও উচই সমাজ থেকে মদ্যপান দূরীভূত হচ্ছে।

অন্যান্য উপজাতিদের মতই উচইদের পোষাক পরিচ্ছদও অতি সামান্যই। উচই পুরুষেরা নিম্নাংগের জন্য নিজের তৈরী "কাঁসা' (লেংটি বিশেষ) এবং উচ্চাংগের জন্য 'খুতাই তাকবরক' (জামা বিশেষ) ব্যবহার করে থাকেন। তবে বর্ত্তমানে তারা এধরণের পোশাক ব্যবহার প্রায় ছেড়ে দিচ্ছেন বললেই চলে। অধিকাংশ বয়স্কদেরই নিজের তৈরী পাছড়া পড়তে দেখা যায়। আধুনিক ছেলেরা শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে অধিকাংশই স্যুট শার্ট ব্যবহার করেন। ধুতি, লুঙ্গির ব্যবহারও নজরে পড়ে।

পোশাক পরিচ্ছদ

পুর্বে সামাজিক প্রথানুযায়ী উচই ছেলেদের তের বছরের আগে কাপড় পড়তে দেয়া হত না। তের বছর পূর্ণ হলেই ':কেবেংবুমি' পূজা দিয়ে ছেলেদের 'কাঁসা' ব্যবহার করতে দেয়া

হত। মেয়েদের 'রিগনাই' বা পাছড়া পড়ার বেলায় তেমন কোন বাঁধা না থাকলেও 'রিসা' (বক্ষাভরন) ব্যবহারের বেলায় ':কবেং বুমি' পুজা দিতে হত। তবে আজকাল অধিকাংশ উচইরাই সে নিয়ম অনুসরণ করছেন না।

উচই মহিলারা নিজের তৈরী 'রিগনাই' কোমড়ে জড়িয়ে বুকে 'রিসা' বাঁধেন। আবার নিজের তৈরী 'খুতাই' ব্লাউজও ব্যবহার করে থাকেন। রিয়াং মহিলাদের তুলনায় তারা একটু হাঁটু নীচ অবধি পাছড়া পড়ে থাকেন বলে দাবী করা হয়। অলংকারের মধ্যে গলায় লক' নামক ছোট ছোট পুঁতির মালা সহ এক ছড়া টাকার মালা পড়েন। হাতে রূপার য়াস '(চুরি বিশেষ) ওত্র (বালা বিশেষ) ব্যবহার করেন। কানে নাবাক, ওয়াথ, ওয়ারে (কানের দোল বিশেষ) ও খোঁপায় সাংগা (লোহার ক্লিপ বিশেষ) ব্যবহার করে থাকেন।

বয়স্কদের মধ্যে উল্লিখিত পোশাক অলংকারের ব্যবহার দেখা গেলেও আধুনিক মেয়েদের মধ্যে সে ধরণের পোশাক ও অলংকারের ব্যবহার খুব কমই নজরে পড়ে। আধুনিক মেয়েরা পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত নিজের তৈরী পাছড়া পরেন। আধুনিক ব্লাউজের ব্যবহারও দেখা যায় আবার অনেকে ছেলেদের মত শার্টও ব্যবহার করেন। তবে শাড়ীর ব্যবহার খুব কম বললেও চলে। হাতে, গলায়, কানে বা নাকে বয়স্কদের মত অলংকার ব্যবহার তারা প্রায় ছেড়ে দিচ্ছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক অলংকারের প্রতিও তাদের আগ্রহ প্রায় দেখা যায় না।

অবসর বিনোদন

অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতই উচইরাও কঠিন পরিশ্রমের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন উপায়ে অবসর বিনোদন করে থাকেন। একসাথে বসে তামাক খাওয়া, মদ্যপান, হাসিঠাট্টা করা ইত্যাদি বাদেও বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ও বুদ্ধির জন্য খেলাধূলা, অতীত স্মৃতিচারণ, পূর্বপুরুষদের কাহিনী, বিভিন্ন ধরনের রূপকথা-উপকথা বলার মাধ্যমে তারা অবসর বিনোদন করে থাকেন।

খেলাধুলা সাধারনত ছেলেমেয়ে, কিশোর কিশোরী ও যুবক যুবতীরাই করে থাকে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বহুদিন ধরে অন্যান্য উপজাতিদের পাশাপাশি বসবাস করার দরুন

খেলাধুলা

কোন খেলা কোন সম্প্রদায় থেকে কে রপ্ত করেছেন তা বলা অত্যন্ত মুশকিল। উচই পুরুষরা সাধারণতঃ সোঁয়াই বা সুকুই (ঘিলা), হাডুডু, উতুংলাইমা (এক বাঁশের মাধ্যমে শক্তি পরীক্ষা) ইত্যাদি খেলার মাধ্যমে বুদ্ধিমত্তা ও শক্তিমানতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। মহিলারা খড়ি, বাঁশের কাইম ইত্যাদির খেলার মাধ্যমে তাদের অবসর বিনোদন করে থাকেন। ছেলেমেয়েরা কানামাছির প্রায় অনুরূপ কানা খেলা, গোলামচুর, দারিয়াবান্দা ইত্যাদি খেলা বাদেও বড়দের অনুকরণে সোঁয়াই হাডুডু, উতুংলাইমা' খড়ি, বাঁশের কাইমের খেলা ইত্যাদি খেলে নিজেকে বাড়িয়ে তোলে। বর্তমানে ফুটবল, ভলিবলের মত আধুনিক খেলার প্রচলনও উচই সমাজে দেখা যায়।

খেলাধুলার মতই ত্রিপুরার প্রায় উপজাতিদের মধ্যেই রূপকথা উপকথাদির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যথাঃ খুইচেমা বা মাথীরাছানি কেরেং কথমা, উাকজরফা বাই

রূপকথা-উপকথা মোসাজরফানি কেরেংকথমা, সিপিংতুই মাইরুংতুই ইত্যাদি রূপকথাগুলি ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, কলই এককথায় কগবরক ভাষাভাষী সমস্ত উপজাতিদের মধ্যে সমভাবেই প্রচলিত।

উচই সমাজে প্রচলিত রূপকথা-উপকথার বিস্তৃত উল্লেখ এ পরিসরে সম্ভব নয় বিধায় নীচে একটি উপকথার উদাহরণ দেয়া গেল।

তেনতিয়ানি কেরেং কথমা

কোন এক গাঁয়ে তেনতিয়া নামে এক লোক ছিল। একদিন সে হাতে তাককুল নিয়ে ঘরের ভিতরে বাইরে ঘোরাফিরা করে ঠিক করল কাজে বেরোবে। কাজে হাত দেবার আগে তার মনে পড়ল তাকুকলে ধার দেয়া দরকার। সামনেই একটি খালি নৌকা দেখতে পেয়ে তার উপরে বসেই আয়েস করে তাকুকলে ধার দেয়া যাবে মনে করে সে নৌকায় গিয়ে বসল এবং একমনে নৌকার গলুইয়ে তাকুকল ধার দিয়ে চলল।

ধার দিচ্ছে তো দিচ্ছেই—তেনতিয়ার কোন হুঁস নেই। হঠাৎ অণ্ডকোষে সাংঘাতিক ব্যথা অনুভব করে তেনতিয়া তড়াক করে লাফিয়ে উঠল এবং দেখতে পেল একটা চিংড়িমাছ পালিয়ে যাচ্ছে। দারুণ রাগ হল চিংড়ি মাছের উপর তার। কিংকর্তব্যবিমূঢ় তেনতিয়া সামনের থাইবাই-এর (এক ধরণের লতার ফল) উপরেই বসিয়ে দিল তাকুকলের কোপ। ঝুপ করে থাইবাই ফল পড়ে গেল জলে। আর পড়বি তো পড় থাইবাইটি একেবারে পড়ল গিয়ে সইল মাছের মাথায়। 'বম' করে লাফিয়ে উঠল সইল মাছ ভয়ে। বাব্বারে সেকি শব্দ! ধারেই এক শূকর কচু-ছড়া খাচ্ছিল আপন মনে সইল মাছের বিরাট লাফ দেখে সেও দিল এক দৌড়। পাশেই একটি ছোট গাছে ছিল এক বাদুরের বাসা। শূকরের বিরাট শরীরের ধাক্কায় গাছটি প্রায় ভাঙ্গেই আর কি। শেষ পর্যন্ত গাছটি রক্ষা পেলেও বাদুরের বাসা আর রক্ষা পায়নি—ছিটকে পড়ল গিয়ে মাটিতে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বাদুর উড়তে শুরু করল দু'চোখ বুজে। উড়তে উড়তে এক সময় যে সুরুৎ করে ঢুকে পড়ল রাজার সাদা হাতীর শুঁড়ে। এদিকে রাজার সাদা হাতী বন্ধ করে দিলে খাওয়া দাওয়া। হাতী রক্ষকেরা কত রকমের খাবার দিল কিন্তু হাতীটি তাকিয়েও দেখছে না সেদিকে। না খেতে খেতে রাজার আদরের সাদা হাতীটি শুকিয়ে যেতে লাগল।

রাজা পড়লেন মহা চিন্তায়। ডাক পড়ল গনৎকারদের। রাজার ডাকে সমস্ত গণৎকার এসে জড়ো হলেন রাজসভায়। শেষে তারা জানালেন, হাতীর শুঁড়ে একটি বাদুর ঢুকে আছে তাই হাতীটির খাবার রুচি উঠে গেছে। সুতরাং বাদুরটাকে বের না করলেই নয়। রাজা তার লোকজনদের আদেশ করলেন একটা লম্বা লোহা আগুনে পোড়া দিতে। আগুনে পুড়ে লোহা যখন টকটকে লাল হল তখন রাজা সেই লোহা উচিয়ে ধরে বাদুরের উদ্দেশ্যে বললেন—বাদুর তুমি বেরোবে কিনা বল? শুঁড়ের ভেতরে থেকেই বাদুর উত্তর দিল—বেরোব কোন দিক দিয়ে?

— কেন মুখ দিয়ে বের হও।

— আমি 'বমি' নই তো।

— মলদ্বার দিয়ে বের হও।

— আমি 'মল' নই তো।

—যেদিক দিয়ে ঢুকেছিলে সেদিক দিয়েই বের হও।

সুতরাং বাদুর আর কি করে। রাজার কড়া হুকুম। বেরিয়ে আসতেই হল তাকে। পরিষদবর্গ বেষ্টিত রাজা মশায়কে দেখে বাদুর সমুহ বিপদের কথা বুঝতে পারল। ঠিক মত গুছিয়ে বলতে না পারলে পোড়ানো লাল টুকটুকে লোহা দিয়ে তাকে মেরে ফেলা হবে। দুরু দুরু বুকে যথাসম্ভব বিনয়ে সে রাজাকে জানাল—মহারাজ আমি আমার বাচ্চাদের নিয়ে বাসায় একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। কিন্তু শূকরটি আমার সে বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাল। এমন জোড়ে সে আমার বাসায় ধাক্কা দিল যে আমার বাসা ভেঙ্গে গিয়ে বাচ্চাগুলো সব মাটিতে ছিটকে পড়ে মরে গেছে। তাই আমি নিজকে বাঁচানোর জন্যই আপনার হাতীর শুঁড়কে নিরাপদ জায়গা ভেবে আশ্রয় নিয়েছি। আমাকে বাঁচান মহারাজ।

রাজা বুঝলেন, বাদুরের কোন দোষ নাই। তাই তাঁর আদেশে ধরে আনা হল শূকরকে। শূকর রাজাকে জানাল যে, সে যখন আপন মনে কচু-ছড়া খাচ্ছিল তখন সইল মাছের বিরাট লাফ দেখে সেও ঘাবড়িয়ে যায় এবং কোথায় কোন দিক দিয়ে পালাবে ঠিক করতে না পেরে যে দিকে দু'চোখ যায় সেদিকেই দৌড়তে থাকে। তার রাস্তাতেই যে বাদুরের বাসা তা তার জানা ছিল না বলেই এই অঘটন।

তারপর ডাক পড়ল সইল মাছের। সেও জানাল যে, তার মাথায় অতর্কিতে থাইবাই ফল পড়েছিল বলেই সে দিশেহারা হয়ে বিরাট লাফ দেয়। পরে রাজার ডাকে সাড়া দিয়ে থাইবাই ফলও জানাল, তেনতিয়ার তাকৃকলের কোপেই সে জলে পড়ে গিয়েছিল।

খোজ পড়ল তেনতিয়ার। সেও আর বলতে ছাড়ে না। নির্দ্বিধায় রাজাকে সে জানাল যে, কাজে বেরোবার আগে নৌকার গলুইয়ে বসে সে যখন আপন মনে তাকৃকলের ধার দিচ্ছিল তখন চিংড়িমাছ তার অণ্ডকোষে চিমটি কাটে, তাই ভয়ে ও রাগে দিশেহারা হয়ে তাকে থাই-বাই ফলে তাকৃকলের কোপ দিতে হয়।

সবশেষে ধরাধরি করে রাজার সামনে আনা হল চিংড়ি মাছকে। সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায় রাজা বিচারে চিংড়ি মাছকে দোষী সাব্যস্ত করলেন এবং তাকে গরম জলে ছেড়ে দেবার আদেশ দিলেন। পেয়াদারা যেই রাজার আদেশ পেল অমনি চিংড়ি মাছকে ধরে ফেলে দিল টগবগে গরম জলে। গরম জলে চিংড়ি মাছের রং লালচে বর্ণ ধরল। রাজা আদেশ দিলেন, আরো সেদ্ধ করো।

পেয়াদারা আরো সেদ্ধ করতে লাগল আর চিংড়ি মাছের রং আরো লাল বর্ণ ধরলো।

গ্রাম প্রশাসন

ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতিদের মতই উচইদেরও নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এই শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি উচই গ্রামকে পরিচালনা করার তথা সমগ্র উচই সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার সুব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। স্মরণাতীত কাল থেকেই বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর এই শাসন ব্যবস্থা জিইয়ে রেখে উচইরা আজো এর মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন সমস্যা, ঝগড়া বিবাদ ইত্যাদি নিজেরাই মীমাংসা করে থাকেন। খুন-খারাপির ঘটনা ব্যতীত চুরি মায় বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়ও তাদের বিচার ব্যবস্থার আওতায় পড়ে। তাই তাদের সমাজের লোকজনকে তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারী আদালতের আশ্রয় খুব কমই নিতে হয়।

উচইদের এই প্রথানুগ শাসন ও বিচার ব্যবস্থার সর্ব্বোচ্চে যিনি থাকেন তাঁকে 'চদিরি' বা 'চৌধুরী' বলা হয়। (চৌধুরী সম্ভবতঃ চকি দারি' শব্দের আধুনিক রূপ বলেই মনে হয়। চুউাক বা চ-ক মানে মদ। দারি মানে ধার্য করা। চ-ক বা মদ যিনি ধার্য্য 'চদিরি' বা 'চৌধুরি' করেন অর্থাৎ যার চ-ক বা মদ ধার্য্য করার ক্ষমতা আছে তিনিই চক দারি চক-দিরি—চদিরি। অতি প্রাচীন নিয়মানুযায়ী উপজাতিরা অন্যায়কারীর শাস্তিস্বরূপ সাধারণতঃ 'মদ' ই ধার্য্য করতেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, কগবরক-ভাষী উপজাতি সমাজের প্রত্যেক শাখাই সাধারণতঃ 'চদিরি' উচ্চারণ করে থাকেন। পরবর্তী সময়ে এই শব্দটিই আধুনিক 'চৌধুরী' শব্দে সর্ব্বাধিক পরিচিতি লাভ করে।) পাড়া ফাং বা যার নেতৃত্বে পাড়া গড়ে উঠে তিনিই সাধারণতঃ চদিরি বা 'চৌধুরী' হন। তাঁর সাহায্যকারী হিসাবে একজন 'কারবারি' থাকেন। চদিরি বা চৌধুরী পদ বংশানুক্রমিক হয়ে থাকে। কোন চদিরি বা চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে যদি অনুপযুক্ত বিবেচিত হয় তাহলে চৌধুরীর ছেলে উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত 'কারবারি' ঐ পদে আসীন থাকেন। কিংবা চৌধুরীর অবর্ত্তমানে কারবারিও যদি ঐ পদের জন্য অক্ষম বিবেচিত হন তাহলে সমস্ত গ্রামবাসীরা সবাইঁ মিলে উপযুক্ত লোককে চৌধুরী নির্ব্বাচন করে থাকেন।

ঝগড়া বিবাদের বেলায় বাদী পক্ষ দু' টাকা ফিস দিয়ে চৌধুরীর কাছে বিচার প্রার্থনা করেন। চৌধুরীর মতানুযায়ী গ্রামবাসীদের কাছে নির্দিষ্ট দিনে বিচার হওয়ার খবর সাধারণতঃ বাদী পক্ষই দিয়ে থাকে। অনেক সময় চৌধুরী অন্য কাউকেও ঐ কাজের জন্য নিয়োগ করতে পারেন।

চোর ধরার বিচারে দোষী যদি সত্যি সত্যিই প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে ষাট টাকা জরিমানা দিতে হবেই। দোষী সাব্যস্ত লোক যদি ঐ টাকা দিতে তালবাহানা আরম্ভ করে তাহলে পরবর্তী বিচারে তাকে ষাট টাকার সাথে আরো ত্রিশ টাকা এবং বিচার ফিস দু' টাকা সহ মোট বিরানব্বই টাকা দিতে হবে। অন্যথায় তার অস্থাবর সম্পত্তি 'ক্রোক' করার অধিকারও চদিরি বা চৌধুরীর আছে। প্রাপ্ত জরিমানার অর্ধেক বাদী পক্ষ ও বাকী অর্ধেক চৌধুরী সহ বিচারকরা (চৌধুরীর সাহায্যকারীরা) নিয়মানুযায়ী পেয়ে থাকেন। ঐ টাকা চৌধুরী বিচারকদের মধ্যে ভাগ করতেও পারেন অথবা সবাইকে একসাথে খাইয়ে আনন্দস্ফূর্তির ব্যবস্থাও করতে পারেন।

ছেলে ও মেয়ের অবৈধ মিলনের ক্ষেত্রে পাঁচ টাকা ও একটি শূকর জরিমানা ধার্য করা হয় এবং তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করানো হয়। এসব ক্ষেত্রে দোষী প্রমাণিত হওয়ার পরও ছেলে যদি সরে দাঁড়ায় অর্থাৎ মেয়েকে বিয়ে করতে গররাজী হয় তাহলে তাকে একশ বিশ টাকা জরিমানা দিতে হয়।

বিবাহ বিচ্ছেদের বেলায় বর্তমানে স্থাবর সম্পত্তিবাদে অস্থাবর সম্পত্তিগুলির সমানভাগে ভাগ করে উভয়কে দেয়া হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে পুরুষ বা মহিলার বেলায় দ্বিতীয় বিবাহে কোন সামাজিক বাধা থাকেনা।

যদিও উচইদের এই সামাজিক শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে বলে তারা দাবী করেন তথাপি এব্যাপারে সঠিক তথ্যের অভাবে কোন সময় থেকে কিংবা কোন মহারাজার আমল থেকে তাদের এই শাসন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়েছিল তা বলা অত্যন্ত কঠিন। তবে পার্শ্ববর্তী উপজাতি গোষ্ঠীর শাসন ব্যবস্থার প্রভাব থেকে তারা মুক্ত একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান

জন্মকালীন সংস্কার ও আচার

অন্যান্য উপজাতিদের মতই উচইরাও জন্মকালীন বিভিন্ন সংস্কার ও আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। সন্তান গর্ভে থাকাকালীনই উচইদের 'তুয় চাউমি পূজা দিতে হয়। সন্তানের মঙ্গল কামনা করে অচাই বা ওঝা কর্তৃক একটি মোরগ বলি দিয়ে জলে এই পূজা দেয়া হয়ে থাকে।

সন্তান প্রসবের সময় উচই রমনীকে আতুর ঘরে রাখা হয়। আতুর ঘরে একজন কুমারজুক বা ধাই ও একজন সাহায্যকারিনী থাকেন। ছেলে সন্তান প্রসব করলে ধাইকে পাঁচ টাকা ও সাহায্যকারিনীকে দু' টাকা এবং মেয়ে হলে ধাইকে দু' টাকা ও সাহায্যকারিনীকে এক টাকা দিতে হয়। বর্ত্তমানে কেউ কেউ কাপড়ও দিয়ে থাকেন।

সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পরেই প্রসূতি ও নবজাতককে গরম জলে স্নান করানো হয়। প্রসূতির কাপড়চোপড় পরিবর্ত্তনের পর সুবিধানুযায়ী একটি জায়গায় আগুন জ্বালানো হয়। সাতদিন ধরে সে আগুন জ্বালানো থাকে। আগুনের ধারে একটি মাটির চাকা বসিয়ে রাখা হয়। প্রসূতির পেটের ব্যথা উঠলেই সেই গরম মাটির চাকার সাহায্যে তাপ দিয়ে ব্যথা দূর করা হয়। সাতদিন পরে নবজাতকের 'হমধাই' বা নাভি কাটা হয় এবং আতুর ঘরের আগুনসহ কাটা নাভি বাসস্থানের একটু দূরে একটি জায়গায় ফেলে দেয়া হয়। তারপরই নবজাতক সহ প্রসূতিকে ঘরে তোলা হয় এবং নবজাতকের নামকরণ হয়। খৃষ্টধর্মাবলম্বীরাও সাতদিন পর প্রার্থনা করে প্রসূতির 'শুদ্ধি' করেন।

পাঁচ মাস পর শিশু যাতে তাড়াতাড়ি দাঁড়াতে ও চলাফেরা করতে পারে সে উদ্দেশ্যে 'বাগচা পূজা' দেওয়া হয়ে থাকে। এই পূজা 'অকচাই' বা 'অচাই' বা ওঝা দিয়ে থাকেন। পূজার উপকরণ হিসাবে প্রয়োজন পাঁচটি মোরগ, বুতুক বা লাংগি একটি, আর গননাহীন আরাক বা বোতলের মদ। তখনই শিশুর গলায় 'লক বা মাদুলি' ধারণ করানো হয়ে থাকে।

এক বছর পর শিশুর সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনায় আর একবার পূজা দেয়া হয়। পূজার উপকরণ হিসাবে একটি শূকর' তিনটি মোরগ' একটি বুতুক বা লাংগি আর গননাহীন 'আরাক' বা বোতলের মদ ব্যবহৃত হয়। আজকাল এই পূজার প্রচলন প্রায় উঠে গেছে বললেই চলে। বলা বাহুল্য, অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সংস্পর্শেই তাদের অনেক পূজা পার্বনের মত এই পূজার প্রচলনও কমে গেছে। তবে এখনও কোন কোন জায়গার অবস্থাপন্ন গৃহস্থরা সন্তানের মঙ্গল কামনার্থে এই পূজা দিয়ে থাকেন।

উচইদের বিয়ে

উচই সামাজিক প্রথানুসারে কোন পাত্রের জন্য কোন পাত্রীর অভিভাবকের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে হলে পাত্রপক্ষকে এক বোতল মদ ও নগদ এক টাকা পাঠাতে হয়। 'রায়বা'

বা ঘটকের আলাপ যদি মোটামুটি আশাব্যঞ্জক হয় তাহলেই পাত্রের বাবা মা বা অভিভাবকরা পাত্রীর বাবা মা বা অভিভাবকের সাথে আলাপে বসেন। নিয়মানুসারে পাত্রীর বাবা মা'র জন্য দু'বোতল মদ এবং পাত্রীর যত ভাই আছে তত বোতল মদ ও তত সংখ্যক মোরগ পাত্র পক্ষকে দিতে হয়। 'কউ সুংমি' বা মঙ্গলাচরণ পর্ব এভাবেই শেষ হয়। তবে আজকাল অনেক জায়গাতেই সেই সমস্ত নিয়মের কিছুটা পরিবর্তন দেখা গেছে। চা, পান সুপারী এবং সামান্য মদের দ্বারাই আজকাল মঙ্গলাচরণের কাজ সমাধা হয়ে থাকে। বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করা তখনও চলে। অথবা অন্য যে কোন দিন সুবিধানুযায়ী দিন তারিখ ঠিক করা হয়। ঐ সময়েও পাত্রপক্ষ পাত্রী পক্ষকে দু' বোতল মদ ও দু' টি 'বুতুক' বা লাংগি দিয়ে থাকেন।

বিয়ের প্রস্তাব ও মঙ্গলাচরণ

বিয়ের নির্দিষ্ট দিনে পাত্রকেই পাত্রীর ঘরে যেতে হয়। যাত্রা পর্ব সাধারণতঃ গোধূলি লগ্নেই হয়ে থাকে। বরযাত্রী হিসাবে যারা যান, তারা প্রত্যেকই যুবক,যুবতী ও সস্ত্রীক থাকেন। কোন বিপত্নীক বা বিধবাকে বরযাত্রী হিসাবে নেয়া হয় না। বরযাত্রীর নেতৃত্বে যিনি থাকেন, তাকে 'আঁদ্রাউংথুমা' বলা হয়। বরযাত্রীরা বাজনা, 'কুসুমু' বা বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে অথবা গান গেয়ে তাদের চলার পথ উল্লাসপূর্ণ রাখেন। বরের পরনে থাকে নতুন কাঁসা, গায়ে নতুন 'খুঁতাই তাকবরক' বা জামা. মাথায় কাঁপার বিরাট পাগড়ী আর কাঁধে থাকে 'দাম্রিং, বা রামদা। বরযাত্রীরা কনের বাড়ীতে পৌঁছার পর উঠানে দাঁড়িয়ে গান গাইতে থাকেন। অপর দিকে কনের পক্ষ থেকেও বরযাত্রীদের সম্বর্ধনা জানিয়ে গান গাওয়া হয়। এইভাবে কিছুক্ষণ গান চলার পর বরযাত্রীরা দরজার গোড়ায় বসিয়ে রাখা জলপূর্ণ কলস নমস্কার করে ঘরের ভেতর ঢুকেন।

বিবাহ অনুষ্ঠান

বরযাত্রীরা বাড়ী থেকেই দু টি 'উাংসুইখক, (৯।১০ ইঞ্চির মত বাঁশের চোঙ্গ, যার নীচের দিকে কোন জায়গায় গুজে রাখার সুবিধার জন্য সামান্য কিছু অংশ লম্বা করে রাখা হয়।) বানিয়ে নিয়ে যান। দু'টি উাংসুইখক এর ভেতরেই থাকে আট বা দশ জোড়া পাতলা বেত। বরযাত্রীরা যে দরজা দিয়ে কনের বাড়ীতে ঢুকেন সেই দরজার বাম বা ডান দিকে একটি এবং অপর দরজার বাম বা ডান দিকে আরেকটি 'উাংসুইখক' গুঁজে রাখেন। যে দরজা দিয়ে বরযাত্রীরা ঘরে ঢুকেন সাধারণতঃ সেই দরজার ধারে কাছেই তাঁদের বসার জায়গা হয় এবং সেদিক 'থংগাকাতৈায়' নামে আর কনের দল যেদিকে বসে সেদিকটা 'থংগাকৗরা' নামে চিহ্নিত হয়।

কনে তার দলবল নিয়ে অন্য ঘরে শুয়ে থাকেন। যথা সময়ে কনের বৌদি ও কুমুইরা (জামাইবাবুরা) মিলে 'হমচাং' বা মশাল নিয়ে কনেকে ধরাধরি করে ঘরে আনেন এখানে উল্লেখ্য যে, কনেকে ধরতে যাওয়ার সময় বৌদি ও কুমুইরা যদি সঙ্গে মশাল না নেন তাহলে জরিমানা স্বরূপ তাদের এক বোতল মদ, একটি লাংগি ও একটি শূকর অথবা বিনিময়ে অনুরূপ টাকা দিতে হয়।

ঘরের মাঝখানে আগে থেকেই একটি 'চাতাই' বা পাতি বিছানো থাকে। বৌদি ও কুমুইরা মিলে ধরাধরি করে ঐ বিছানো পাতিতে বরকনেকে একত্রে শুইয়ে দেন। 'রিকাথার' বা অব্যবহৃত পাছড়া দিয়ে বরকনেকে ঢেকে দিয়ে কাপড়ের চার কোনায় চারজন পা দিয়ে কাপড় চেপে রাখেন। একে একে উপস্থিত সকলেই জিজ্ঞেস করেন তাদের কি হয়েছে? তারা কেন একত্রে শুয়ে রয়েছে?

তখন উপস্থিতদের মধ্যে থেকেই উত্তর আসে—তাদের মধ্যে বিয়ে হয়েছে তাই তারা একসাথে শুয়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সবাই হাততালি দিয়ে সমস্বরে চিৎকার করে উঠেন। ''লাচিয়া'' লাচিয়া'' (নির্লজ্জ নির্লজ্জ) বলে।

এরপর 'আঁদ্রাউংথুমা' বরকনের মাথায় জলের ছিটে দিয়ে আশীর্বাদ করলে বাপ-মা আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপড়শী প্রত্যেকেই তদনুরূপ জলের ছিটে দিয়ে নবদম্পতির সুখী ভবিষ্যৎ কামনা করে আশীর্ব্বাদ দিতে শুরু করেন।

এইরূপ আনন্দঘন পরিবেশে বিয়ের কাজ চলাকালীন সময় থেকেই চলে মদ্যপান। নিয়মানুসারে দু'টি লাংগিই বিয়েতে দেয়া হলেও 'আরাক' বা বোতল থাকে গণনাহীন। তাই মদ্যপানের সাথে সাথে চলে নাচগান হাসিঠাট্টা সহ বিভিন্নভাবে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ।

বিয়ের দিন থেকেই নবদম্পতিদের সহবাস উচই সমাজে স্বীকৃত। পরের দিন খুব ভোরে অন্য কারোর জাগার আগেই নবদম্পতিকে কুয়া থেকে দু'কলস জল ভরে আনতে হয়। শ্বশুর শ্বাশুরী ঘুম থেকে উঠার পর বর দুটি ঘটিতে ঐ কলস দু'টির জল শ্বশুর শ্বাশুরীর হাতে তুলে দেন। তারপর 'থংগাকারার দিকে গুজে রাখা উাংসুইথক থেকে একটি বেত এনে শ্বশুরের হাতে এবং থংগাকাতৌয়'র এর দিকে গুঁজে রাখা 'উাংসুইথক' থেকে একটি বেত এনে শ্বাশুরীর হাতে দেন। শ্বশুর শ্বাশুরী মুখ ধোয়ার পর ঐ বেত দিয়ে জিহ্বা পরিস্কার করেন। কেউ কেউ এক সপ্তাহ বা কেউ কেউ পনর দিন এই নিয়ম পালন করে থাকেন।

বিয়ের দিন থেকেই বরকে শ্বশুর বাড়ীতে থেকে যেতে হয় এবং চার বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে শ্বশুর বাড়ীতেই থাকতে হবে। এ প্রথা 'চামারি' (জামাই) নামে প্রসিদ্ধ। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, চার বছরের বেশী একদিনও (বিবাহের দিন থেকে ধরে) চামারি বা জামাইকে ঘরে রাখার নিয়ম নেই। অন্যথায় খাওয়া পরার দ্বিগুণ খরচ শ্বশুর মহাশয়কে বহন করতে হয়।

উচইরা সাধারণতঃ নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক রাখলেও অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য উপ-গোষ্ঠীর সঙ্গেও বিবাহ সম্পর্ক রেখে থাকেন। সেক্ষেত্রে যদি কোন উচই ছেলে বা মেয়ে অন্য যে কোন সমাজের নিয়মানুসারে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকেন তাহলে তাঁকে আর উচই

সমাজরীতি পালন করতে হয় না। নির্দ্বিধায় উচইরা সেই বিবাহ বৈধ বলে মেনে নেন। অন্যথায় সামাজিক বিচারের ব্যবস্থা হয়।

নীচে কয়েকজন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক রক্ষাকারীদের নামের তালিকা দেয়া হল।

নাম	পাড়া	স্ত্রী বা স্বামীর নাম	সম্প্রদায়
শ্রীকাশীরাম উচই	উত্তর একছড়ি	মনীকা লাগাড়ু	পুর্তুগীজ বংশধর
শ্রীঅচন্দ্র উচই	রাঙ্গাছড়া	রমা রিয়াং	রিয়াং
শ্রীমেস্তুয়া উচই	পশ্চিম ডেপাছড়া	মালবতী রিয়াং	রিয়াং
শ্রীফিলিপ উচই	ঐ	রমা চিসিম	গারু
শ্রীজগৎ উচই	রাঙ্গাছড়া	ঝর্ণা দেববর্মা	ত্রিপুরী
শ্রীঅমকুমা উচই	একছড়ি	সূর্যলক্ষী দেববর্মা	ত্রিপুরী
শ্রীঠাণ্ডা ফ্রান্সিস উচই	ডেপাছড়া	মনিকা মগ	মগ
শ্রীভূগুরাম উচই	ঐ	—	রিয়াং
শ্রীসঘরাম উচই	একছড়ি	—	মগ
শ্রীপ্লাসিড উচই	ঐ	—	ত্রিপুরী
শ্রীঅতিরাম উচই	পশ্চিম ডেপাছড়া	—	ত্রিপুরী
শ্রীমতী রাজিরুড উচই	রতনপুর ১	—	ত্রিপুরী
শ্রীমতী কাথারিনা (সোমা) উচই	পশ্চিম ডেপাছড়া	মিছিল মলছম	হালাম
শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া উচই	ঐ	ধনঞ্জয় দেববর্মা	ত্রিপুরী
শ্রীমতী কন্যাতি উচই	ঐ	ধনচন্দ্র দেববর্মা	ঐ

আধুনিক শিক্ষিত ছেলেরা অনেকেই 'চামারি' বা জামাই থাকার প্রথাকে বেশী পছন্দ করেন না। এমনকি 'চামারি' শব্দটিও তুলে দিয়ে তারা ঐ শব্দের পরিপূরক হিসাবে 'সেবারি' শব্দ প্রবর্তনের চেষ্টায় আছেন। সে যা হোক, আজকাল 'চামারি'র পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে পণ প্রথার প্রচলনও দেখা যায়।

পণের পরিমাণ ষাট টাকা হলেও অনেক ক্ষেত্রে একশ বিশ টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। খৃষ্টান উচইরা চা, পান ইত্যাদির মাধ্যমে প্রস্তাব ও মঙ্গলাচরণের কাজ সমাধা করে থাকেন। তাদের বিবাহনুষ্ঠান গীর্জাতেই হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, ফাদার-এর মাধ্যমেই এই বিবাহকার্য সমাধা হয়। যৌতুক হিসাবে শার্ট, প্যান্ট ইত্যাদি দেয়ার প্রচলনও খৃষ্টানদের মধ্যে দেখা যায়।

উচইদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনাও কিছু কিছু নজরে পড়ে। সামাজিক আচারে

যদি সত্যিই তাদের বিচ্ছেদ বৈধ বলে গণ্য হয় তাহলে সমাজ তা মেনে নেয় এবং পুরুষ ও মহিলা উভয়েই দ্বিতীয়বার বিবাহ করার সুযোগ পায়। বিবাহ বিচ্ছেদে এক পক্ষ গররাজী থাকলে সামাজিক বিচারে বাদীপক্ষকে জরিমানা দিতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের বিচ্ছেদ বৈধ বলেই গণ্য হয়। স্বামী স্ত্রী সন্তান সম্পত্তির মালিক হলে বিচ্ছেদের বেলায় উভয়ের মধ্যে সন্তান ভাগ হয়। স্থাবর সম্পত্তি বাদে অস্থাবর সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারাও বিচ্ছেদের বেলায় হয়ে থাকে।

বিবাহ বিচ্ছেদ

দেব-দেবী ও পূজা-পার্বন

ত্রিপুরার ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, কলই, নোয়াতিয়া ইত্যাদি উপজাতিদের সঙ্গে উচইদের দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস ও বিভিন্ন পূজা পার্বনে প্রায়ই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

নীচে উচইদের বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস ও প্রচলিত পূজা পার্ব্বনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

রনতক পূজা : জুমের ধান কাটা শেষ হলে 'মায় কাঁতাল' বা নবান্নোৎসবের সময় এই পূজা দেয়া হয়ে থাকে। দুটি বড় ঘট বা পাতিল ভাল করে ধুয়ে মুছে পিঠালি দিয়ে চিত্রিত করা হয়। আর হাতে কাটা জুমের সুতা দিয়ে তুলার মালা তৈরী করে রনতক বা পাতিল দুটির গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়। নতুন আতপ চাল দিয়ে ঘট বা পাতিল দুটিকে পূর্ণ করে উপরে সরা দিয়ে ঢাকা হয়। এই পূজা মালিমা বা ধান্য অধিষ্ঠাত্রী দেবী নামে পরিচিত। ঘট বা পাতিল পরিপূর্ণ চালের মতই গৃহস্থের ঘর যাতে শস্যপূর্ণ থাকে এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তারা এই পূজা দিয়ে থাকেন। নববর্ষ ও লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিনগুলিতেও তাঁরা রনতক পূজা দিয়ে থাকেন।

কের পূজা : বছরে একবার চদিরি বা চৌধুরীর বাড়ীতে কের পূজা অবশ্যই করতে হয়। এই পূজা রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ পরিচিত পূজা। রাজা তথা রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের মঙ্গল কামনায় রাজার কের পূজা সাঙ্গ হবার পর প্রজারা খাদ্য উৎপাদনের মত কঠিন পরিশ্রমের কাজ শেষ হলে সাধারণত অগ্রহায়ন মাসে এই পূজা দিয়ে থাকেন। গ্রামের তথা গ্রামবাসীদের মঙ্গলার্থে সমস্ত গ্রামবাসীদের চাঁদায় এই পূজার ব্যয় নির্বাহ করা হয়। পূজার দিন গ্রামের সব লোক চৌধুরীর বাড়ীতে জড়ো হয়। আনন্দপূর্ণ পরিবেশে একত্রে পানাহারের মাধ্যমে দিনটি অতিবাহিত হয়। পূজার শুরুর পর থেকে শেষ না হওয়া পর্যন্ত গ্রামের বাইরে কাকেও যেতে দেয়া হয় না এবং বাইরে থেকেও কাউকে গ্রামে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে যে কোন ব্যক্তিকে শাস্তিস্বরূপ কিছু জরিমানা দিতে হয়। আগে কের পূজার নিয়ম ভঙ্গকারীকে দ্বিতীয়বার পূজানুষ্ঠানের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে হত। বর্ত্তমানে বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হয়ে এই পূজার কঠোর নিয়মবিধিও বহুলাংশে লোপ পেতে শুরু করেছে।

তুয়মা বা গঙ্গা পূজা : জলদেবতার উদ্দেশ্যে পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তুয়মা বা গঙ্গা পূজা দেয়া হয়ে থাকে। কোন নদী বা ছড়ার কিনারায় বাঁশের মন্দির তৈরী করে এই পূজা দেয়া হয়। এই পূজা আগে মহিষ, শূকর, পাঁঠা বলির মধ্য দিয়ে খুব আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাধা হলেও বর্ত্তমানে চাল, কলা, বাতাসা ইত্যাদি দিয়েই এই পূজা দেয়া হয়ে থাকে।

নকস্নু মতাই : পরিবারিক মঙ্গল কামনায় নকস্নু মতাই বা গৃহকোনের পূজা তারা কেউ কেউ দিয়ে থাকেন। নকস্নুকে তারা সাপের দেবী বলে বিশ্বাস করেন। এই পূজা দেয়ার ফলে সাপের কামড় থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বলেও তাঁদের বিশ্বাস। এছাড়াও বদহজম, প্লীহা ইত্যাদি রোগ নিরাময়ের জন্য তারা নকস্নু মতাই-এর পূজা দিয়ে থাকেন।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, ত্রিপুরী রিয়াংদের মতই উচইদেরও কোন দেবদেবীর প্রতিকৃতি নেই। অনেক পূজাই তারা বাঁশের তৈরী দেবদেবীর প্রতিক সামনে রেখে সমাধা করেন। এই প্রতীক 'লাম্প্রাওয়াথপ' নামে প্রসিদ্ধ।

হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে উচইরা কৃষ্ণজন্মাষ্টমী, লক্ষ্মীপূজা, দূর্গাপূজা সরস্বতী পূজা দোল পূর্ণিমা, রথযাত্রা প্রভৃতি উৎসবগুলিও উৎসাহের সঙ্গে পালন করেন। বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্মাবলম্বী উচইরা স্ব স্ব ধর্মের নিয়মানুযায়ী অবশ্য পালনীয় উৎসবগুলি পালন করে থাকেন।

রোগ নিরাময়

বিভিন্ন অসুখ বিসুখের সময় উচই সমাজের 'হকচাই' বা ওঝা কর্তৃক ঝারফুক ও পূজা দেয়ার প্রথায় বিশ্বাসী হলেও আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তাঁরা অধিকাংশই ডাক্তারদের পরামর্শে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু তথাকথিত অঞ্চলগুলিতে শিক্ষিত ডাক্তার ও চিকিৎসালয়ের অভাব থাকায় অল্প শিক্ষিত 'হাতুরে' ডাক্তারদের উঁচুদরের (হাই রেইটের) অথচ নিষ্ফল চিকিৎসা অনেক সময় তাঁদের অধুনিক চিকিৎসার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে দেয়। সেইসব ক্ষেত্রে গ্রাম্য ওঝারাই আবার আসন গেড়ে বসে। অনেক সময় তারা পাহাড়ী লতাপাতার দ্বারা ঔষধ তৈরী করার পদ্ধতি শিখে 'কবিরাজ' বনে যায়। অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসার সঙ্গে সরব প্রতিযোগিতায়ও তারা মেতে উঠে। আধুনিক সুচিকিৎসার মন্থরগতিতাই তাদের তদ্রূপ আচরণ বাড়িয়ে দেয়ার জন্য অন্যতম দায়ী। শুধু উচই পল্লীতেই নয়, ত্রিপুরার বিভিন্ন পাহাড় অঞ্চলগুলিতেও ঐ একই চিত্র লক্ষ্যণীয়ভাবে বর্তমান।

মৃত্যুকালীন সংস্কার

অন্যান্য উপজাতিদের মতই উচইরাও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। ইহকালে ভাল কাজ করলে পরকালেও এর সুফল ভোগ করা যায়—এই বিশ্বাস থেকেই জগতের যাবতীয় গর্হিত কাজ থেকে তাঁরা যথাসম্ভব দূরে থাকতে চেষ্টা করেন।

মৃত ব্যক্তিকে উচইরা সাধারণতঃ দাহ করে থাকেন। মৃত শিশুর বেলায় বাবামা'র মত্যানুসারে দাহ কিংবা কবরস্থ করা হয়ে থাকে।

মৃত ব্যক্তিকে বাইরের উঠানে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় চোপড় পরিয়ে আবার ঘরের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একটি জায়গায় শুইয়ে রাখা হয়। আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপড়শীরা মিলে মৃত ব্যক্তিকে ঘিরে চারিদিকে সবাই বসেন। সারা রাত ধরে মৃত ব্যক্তির পাশে বসে সময়ে সময়ে কান্নাকাটি ও গানবাজনা করা হয়। কেউ কেউ

রামায়ন, মহাভারত পাঠ করেন আর খৃষ্টান যাঁরা তাঁরা বাইবেল পড়ে মৃত ব্যক্তিকে পাহাড়া দেন। এভাবে মৃত ব্যক্তিকে সারারাত পাহাড়া দেয়ার পেছনে দু'টি কারণ বিরাজমান। প্রথমতঃ যিনি মৃত তিনি চিরদিনের মত আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসীদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তাই অন্ততঃ শেষবারের মত একরাত তার মুখ দেখা ও তাকে সঙ্গ দেয়া। দ্বিতীয়তঃ, দূরের আত্মীয়স্বজনেরা এসে যাতে অন্ততঃ মৃতব্যক্তির মুখ শেষবারের মত দেখে মনের আপশোষ মেটান।

পরদিন ভোরে বাঁশ ও বেতের সাহায্যে 'তলাই' বানিয়ে মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। আত্মীয় স্বজন ও গ্রামবাসীরা মৃতব্যক্তির নামে সাধ্যানুযায়ী খুচরো পয়সা দিয়ে থাকেন। নারীপুরুষ নির্বিশেষে যখন শবানুগমন করেন, তখন ঐ খুচরো পয়সাগুলি সারা পথ ধরে ছিটিয়ে দেয়া হয়।

শ্মশানভুমিতে দাহ করবার নির্দিষ্ট জায়গায় মৃতব্যক্তিকে শুইয়ে তাঁর চারদিকে আত্মীয়স্বজন সাতবার প্রদক্ষিণ করেন। মৃত পুরুষের বেলায় পাঁচস্তরে লাকড়ি সাজানো হয় এবং মৃত মহিলার বেলায় সাত স্তরে লাকড়ি সাজানো হয়ে থাকে। এইভাবে বিভিন্ন স্তরে লাকড়ি সাজিয়ে আগুন লাগানোর পর থেকে সম্পূর্ণ দাহ না হওয়া পর্যন্ত অধিকাংশ পুরুষই শ্মশানভূমিতে থাকেন।

মৃত ব্যক্তির দূরবর্তী স্থান থেকে যে সমস্ত আত্মীয় স্বজনরা আসেন তাঁদের খাওয়ানোর ভার সাধারণতঃ গ্রামবাসীরাই বহন করে থাকেন। সমস্ত আত্মীয় স্বজনরাই কেউ তিন দিন বা পাঁচদিন নিরামিষ খেয়ে মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে শোক প্রকাশ করে থাকেন। শ্রাদ্ধাদির কাজে তেমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। অসচ্ছল গৃহস্থরা যখন ঘরে ধান উঠে তখনই সুবিধা বুঝে শ্রাদ্ধ করে থাকেন। সচ্ছল গৃহস্থরাও অনেক সময় সে নিয়ম পালন করেন।

খৃষ্টান উচইরা তাঁদের নিয়মানুযায়ী প্রার্থনা করে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

সমাজ-সংস্কৃতি গতিশীল। জলের স্রোত ধারার ন্যায় অবিরাম গতিতে সামনের দিকে বয়ে যাওয়াই তার ধর্ম। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে চলার পথে কারোর সঙ্গে মিলনের পরও জলের স্রোতধারার অভীষ্ট লক্ষ্য যেমন মহামিলনের ক্ষেত্র সাগর, তদ্রূপ ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতিও তার আপনগতিতে নীরবে এগিয়ে চলছে সংস্কৃতির মহামিলন ক্ষেত্রের দিকে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচিত উচইদের বিভিন্ন সংস্কার, সামাজিক রীতিনীতি ও জীবনধারার বিভিন্ন দিকও বর্তমানে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর সান্নিধ্যে এসে প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরী, জমাতিয়া, কুকি প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর পাশাপাশি বসবাসের ফলে পরস্পরের মধ্যে সংস্কৃতির আদান প্রদান যেমন হয়েছে তেমনি বৃহত্তর সমতল জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রভাবও তাদের জীবনস্রোতকে প্রভাবিত করছে। এছাড়াও শহর, সিনেমাসহ অন্যান্য সংস্কৃতির প্রভাব, সরকারী উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি উচইদের জীবনযাত্রা পরিবর্তনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এই পরিবর্তিত বিষয়গুলিকে মূলত: তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—(ক) অর্থনৈতিক (খ) সামাজিক ও (গ) রাজনৈতিক।

অন্যান্য উপজাতিদের মতই উচইদের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। প্রাচীনকালে আদিম প্রথার জুমচাষই ছিল তাঁদের একমাত্র প্রধান উপজীবিকা। স্থান পরিবর্তনশীল এই প্রথায় এক

(ক) অর্থনৈতিক

পাহাড়ে জুমচাষ শেষ হলে বৎসরান্তে আবার অন্য পাহাড়ে চাষের সঙ্গে সঙ্গে চলত বাসাবদলও। বর্তমানে উচইরা সে অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে স্থায়ী চাষ ও স্থায়ী বসবাসের দিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়েছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। বলাবাহুল্য, তাঁদের এ অভ্যাসও শিক্ষা সমতলবাসীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত। বিভিন্ন

কৃষি

উচই গ্রামগুলিতে দেখা যায়, অনেকেই জুমচাষ সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমতল কৃষিকাজে মনোনিবেশ করেছেন। আবার কেউ কেউ উভয় কৃষিকাজই করে চলেছেন। যাদের সমতল জায়গা নেই কিংবা এক সময় জায়গা অর্জনের পরও হাতছাড়া হয়ে পড়েছেন তাঁরা অনেকেই প্রাচীন প্রথার জুমজীবন আঁকড়ে আছেন কিংবা বাধ্য হচ্ছেন।

কুটির শিল্প জীবনেও তাঁদের পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। বিশেষ করে বাঁশ ও বেতের জিনিষ তৈরী করার অভ্যাস প্রায় উঠে গেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। বয়স্কদের মধ্যে অনেকে সে

বাঁশ-বেতশিল্প

কাজ জানলেও আধুনিকদের মধ্যে অধিকাংশ বাঁশ-বেতের সম্পূর্ণ কাজ জানেন না। ট্রাঙ্ক, সিন্দুক, আলমারী ইত্যাদি জিনিষকেই বর্তমানে অনেক মূল্যবান জিনিষ পত্র রাখার বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করছেন। তাই অনেকের ঘরেই বাঁশ-বেতের সেই জাপা, বখক ইত্যাদি নেই। আবার জিনিষ-

পত্র বহনের জন্য আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেকেই ব্যাগ, স্যুটকেশ ইত্যাদি ব্যবহার করছেন।

বয়ন শিল্পেও তাঁদের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। জুম চাষের পরিধি কমে যাওয়ার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবে কার্পাস উৎপাদনও কমে গেছে এবং নিজস্ব কায়দায় সূতা তৈরী করে কাপড় বোনার প্রথাও প্রায় উঠে গেছে। বাজার থেকে রং বেরং এর সূতা কিনেই তাঁরা এখন সে অভাব পূরণ করেছেন। আবার অধিকাংশই বাজারের প্যান্ট, শার্ট, শাড়ী, ব্লাউজ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাপড় যোগার করছেন বলে উচই পরিবারের বয়ন শিল্প প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে সরকার থেকে বিভিন্নভাবে সূতা দিয়ে তাদের সেই বয়নশিল্পকে আবার জাগিয়ে তুলবার প্রচেষ্টা গ্রহণও নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

বয়ন শিল্প

উচইদের মধ্যে মৎস্য চাষের প্রবণতাও লক্ষ্য করা গেছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিংবা সরকারী সাহায্য নিয়ে অনেকেই মৎস্য চাষে মনোনিবেশ করছেন এক কথায় আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়ায় তাঁদের অর্থনীতিকে তারা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক পদ্ধতিতে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথ বেছে নিয়েছেন।

মৎস্যচাষ

উচইদের কৃষিকাজের পদ্ধতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনের ক্ষেত্রে গরু, মহিষ পালনও উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বর্ত্তমানে প্রায় উচই পরিবারেই হাস, মুরগী, শূকরাদির পাশাপাশি গরু, মহিষ পালনও দেখা যায়। নিজস্ব উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয় করে অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়া প্রত্যক্ষ ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উচইরা খুব বিরল। দক্ষিণ ত্রিপুরাবাসী কোন উচইকেই প্রত্যক্ষ ব্যবসা বাণিজ্যে অংশ গ্রহণে দেখা যায় না।

পশুপালন ও ব্যবসা বাণিজ্য

কৃষি পদ্ধতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উচইদের সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তনও স্বাভাবিক ভাবে ঘটেছে। তাঁদের দেবদেবীর প্রতি সাধারণ বিশ্বাস থেকে পূজা-পার্ব্বন, আভ্যন্তরীন গ্রাম প্রশাসন ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। উচইরা রাজ্যের অন্যান্য উপজাতিদের তুলনায় লক্ষ্যণীয়ভাবে সংখ্যায় কম হলেও আশ্চর্য্যজনকভাবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী। এই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী উচইদের সামাজিক রীতিনীতি তাই ধর্মবিশেষে পার্থক্য লক্ষ্যণীয়।

(খ) সামাজিক

উচইদের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান—এই তিন প্রধান ধর্মাবলম্বী লোকদের দেখা যায়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেক বৈষ্ণব আছেন। দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া মহকুমার রতনপুর, মহুরীপুর ও চরকবাই অঞ্চলে তাঁদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে একটু বেশী। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও ঐ অঞ্চলেই বেশীর ভাগ আছেন। বৌদ্ধ ধর্মমতে প্রথাগত সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্ত্তন প্রয়োজন নয় বিধায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা উচই প্রথানুযায়ীই সাধারনতঃ সামাজিক প্রথা ও সংস্কারাদি পালন করে থাকেন। খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীরা তাঁদের নিয়মানুসারে সামাজিক বিভিন্ন সংস্কার পালন করেন। রোমান ক্যাথলিক ও ব্যাপ্টাইজ এই দু'শ্রেণীর খৃষ্টানই

ধর্ম ও সামাজিক সংস্কার

উচইদের মধ্যে দেখা যায়। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অমরপুর মহকুমার সখরাম উচই পাড়া, কেয়াই উচই পাড়া, পশ্চিম ডেপাছড়া, শান্তিনগর, রাঙ্গাছড়া, ইত্যাদি পাড়ায় তাঁরা অধিক সংখ্যায় বাস করেন।

ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ ও ধর্মীয় ভাবধারার উর্দ্ধে থেকে উচইদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন লক্ষ্যে সম্প্রতি 'ত্রিপুরা উচই জাতিনি আতাইবাং' (ত্রিপুরা উচই জাতীয় সংস্থা বা সম্মেলন) নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে। জমাতিয়া হদার অনুকরণে গঠিত এই সংস্থার ছত্র ছায়ায় সমগ্র উচই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। আগরতলা বুদ্ধ মন্দিরের ভিক্ষু শ্রী অক্ষয়ানন্দ ভান্তের (উচই) উদ্যোগে গত ১৯৭৯ইং সনে এই সংস্থা গঠিত হলেও সামাজিক সংস্কার মূলক কোন কাজে এই সংস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে শ্রী ফিলিপ উইচ ও শ্রী ঠাগু ফ্রান্সিস উইচ এর যৌথ প্রচেষ্টায় এই সংস্থার কিছু কিছু কাজ সমাজের নজরে পড়ে। উক্ত সংস্থার সর্বোচ্চে যিনি থাকেন তাঁকে 'সারপা' বলা হয়। এছাড়া প্রতি পাড়া থেকেই সংস্থার দু'জন করে প্রতিনিধি থাকেন। বৎসরান্তের জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাসে এই সংস্থার সম্মেলন হয়ে থাকে। প্রতি পাঁচ বৎসরান্তে সংস্থার প্রতিনিধিদের ভোটে 'সারপা' নির্ব্বাচিত হন।

'ত্রিপুরা উচই জাতিনি আতাইবাং

আতাইবাং-এর নিয়মানুসারে বংশানুক্রমিক পাড়ার 'চৌধুরী' ব্যবস্থা তুলে দিয়ে যোগ্যতানুযায়ী 'চৌধুরী' নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের বিষয়ে বাদী বিবাদীরা যদি চৌধুরীর বিচারে সন্তুষ্ট না হয় তাহলে পার্শ্ববর্তী পাড়ার চৌধুরীদের যৌথ বিচার এবং তাতেও যদি বিচারের সুরাহা না হয় তাহলে 'সারপা'র নিকট বিচার দেয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পোশাক পরিচ্ছদেও যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। আধুনিক উচই মেয়েরা প্রাচীন পদ্ধতিতে পোশাক পরা ও অলংকার ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁরা নিজের হাতে তৈরী পাছড়া কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত ঢেকে পড়েন। শাড়ীর ব্যবহারও নজরে পড়ে। অলংকার হিসাবে বাজারের কানের দুল, গলার হার ও চুরি ব্যবহার করছেন। উচই পুরুষদের পোশাক পরিচ্ছদের বেলায়ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। তাঁদের অধিকাংশই প্রাচীন পোশাক ছেড়ে দিয়ে বাজার থেকে মিলের তৈরী কাপড় পরিধান করছেন। শিক্ষিত উচইরা আধুনিকতার ছোঁয়ায় প্যান্ট শার্ট পরিধান করছেন।

পোষাক পরিচ্ছদ

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উচইদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের আলোকে সর্বভারতীয় ও আঞ্চলিক উভয় রাজনৈতিক দলের চিন্তাধারার সঙ্গেই তাঁরা সম পরিচিত। কংগ্রেস, সি পি আই (এম), সি পি আই, উপজাতি যুব সমিতি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁদের মধ্যে সুস্পষ্ট।

(গ) রাজনৈতিক

উচইদের মধ্যে বর্তমানে অনেকেই গ্রামের মুখ্য ও দায়িত্বপূর্ণ প্রশাসন গাঁও প্রধানের পদে আসীন। এদের মধ্যে অমরপুরের উত্তর একছড়ি গাঁওসভার প্রধান শ্রী সঘরাম উচই, বিলোনীয়ার ২ নং রতনপুরের গাঁও প্রধান শ্রী অম্বাচন্দ্র উচই ও তীর্থমুখের প্রধান শ্রী রামানন্দ বৈষ্ণবের (উচই) নাম উল্লেখ করা যায়। এরা তিনজনই সি পি আই (এম)—এর সদস্য।

উপসংহার

পরিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উচইদের অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তনের কথা পূর্ব্ববর্তী আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষা

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরূপ দ্রুত তালে পরিবর্তনের আলোকে তাঁরাও একথা আজ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, শিক্ষা ব্যতিরেকে আধুনিক প্রতিযোগিতা মূলক যুগে স্বনির্ভরতা অর্জ্জন করা যায় না। তাই তাঁরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে বংশধরদের শিক্ষা দেয়ার বিষয়ে মনোনিবেশ করছেন। এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে অন্যতম শিক্ষিত শ্রী ফিলিপ উচই-এর (বি এ, বি টি, বর্তমানে শিলাছড়ি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করছেন) ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

উচইদের সঙ্গে বিভিন্ন জাতি-উপজাতি গোষ্ঠীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে তাঁদের সমাজে যেমন কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে তেমনি শহরের ও

মিশ্র সংস্কৃতি

পার্শ্ববর্তী বাজারগুলির সংস্পর্শে থাকার ফলে আধুনিক সভ্যতার প্রভাবও তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। বর্তমানে অনেক উচই বাড়ীতেই ঘড়ি, সাইকেল, রেডিওর মত আধুনিক দ্রব্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে এখন মদ্যপানের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। বিশেষ করে হিন্দু বৈষ্ণব এবং খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বী ব্যাপ্টাইজদের মধ্যে মদ্যভ্যাস একেবারেই নেই। তাঁদের নিত্য ব্যবহার্য জিনিষপত্র, রান্না করার পদ্ধতি, ঘরদরজা তৈরীর নমুনা, খাদ্য ইত্যাদি সব বিষয়েই বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে এবং প্রতিনিয়তই এই পরিবর্তন ঘটছে।

যেসব বই থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছিল

১।	রাজমালা	
	প্রথম লহর দ্বিতীয় লহর তৃতীয় লহর	শ্রীকালী প্রসন্ন সেন।
২।	রাজমালা—	কৈলাস চন্দ্র সিংহ।
৩।	লোকবৃত্তের আলোকে কলই সম্প্রদায়—	শ্রীপ্রদীপ নাথ ভট্টাচার্য্য, গবেষণাধিকার, উপজাতি ও তপশিল জাতি কল্যাণ দপ্তর।
৪।	রিয়াং—	শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা।
৫।	রমাপ্রসাদ গবেষণাগার—	আগরতলা।
৬।	Tripura—	Directorate of information, Cultural Affairs & Tourism. Govt. of Tripura.
৭।	Tripura District Gazetters—	Directorate of Education,
৮।	Tribal History of Eastern India—	E. T. Dalton.
৯।	Wild races of South Eastern India—	T. H. Lewin.
১০।	The wild Tribes of India—	H. B. Rowney
১১।	Tripura Through the Ages—	N. R. Roychowdhury.
১২।	The Kaipengs—	Directorate of Research, Department of welfare for Scheduled Tribes & Scheduled Casts.
১৩।	The Kukis of Tripura—	Ram Gopal Singh.
১৪।	Socio Economic Survey of the Noatia Tribes—	Dr. S. B. Saha.

বয়স্ক উচই দম্পতি

'থানতি' বা কোমড় তাঁত বোনায় রত উচই রমণী।

ধান ভানার আনন্দে উচই কিশোরী

কেয়ই উচই পাড়ার চৌধূরী

উচই আধুনিকা

আধুনিক উচই দম্পতি

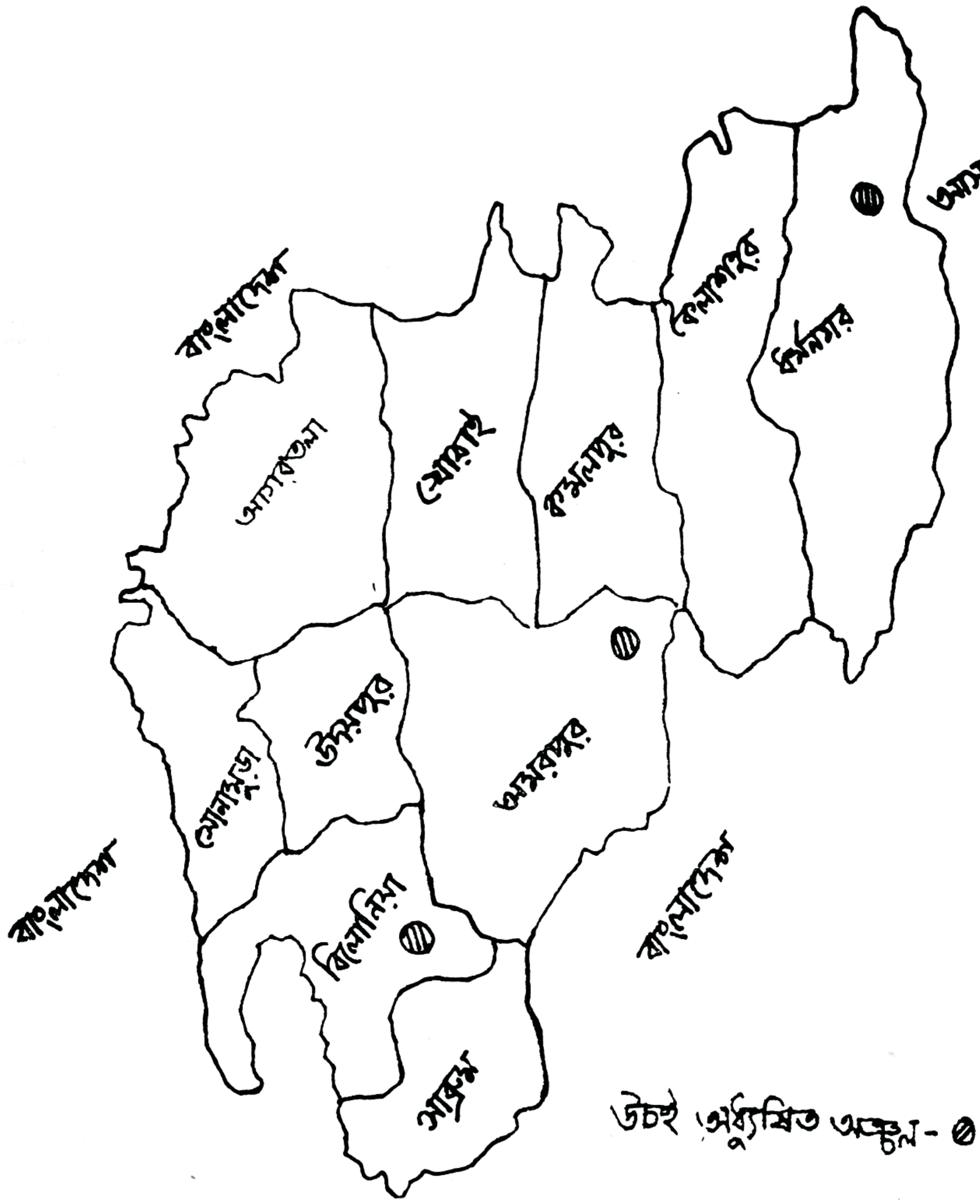
বাংলাদেশ
আসাম
আগরতলা
খোয়াই
কমলপুর
কৈলাশহর
ধর্মনগর
সোনামুড়া
উদয়পুর
অমরপুর
বাংলাদেশ
বিলোনিয়া
বাংলাদেশ
সাব্রুম
উচাই অধ্যুষিত অঞ্চল -